Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শ্যামলী আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১০৭২

১৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শ্যামলী আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১০৭২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শ্যামলী আক্তার, আইডিঃ ২১৫০০১০৭২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

(স্বাক্ষর)

শ্যামলী আক্তার

আইডিঃ ২১৫০০১০৭২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রারম্ভিকা	৫
চিন্তার মাপকাঠি ও মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব	৭
আল্লাহর দ্বীন: অনুসারী ও পথভ্রষ্টদের ইতিহাস	৮
ইসলাম	১২
খারিজী:অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের সূচনা	১৬
বর্তমান বিশ্ব	১৮
ধর্মহীনতার দর্শন	১৯
ধর্মহীনতার আন্দোলন	২০
সেক্যুলারিজম ও অন্যান্য	২২
ইউরোপের রেনেসাঁ ও ফরাসি বিপ্লব	২৪
ষড়যন্ত্রের কবলে মুসলিম উম্মাহ ও আল্লাহর সৈনিকদের প্রতিরোধ	২৮
জিহাদের পরিচয়	৪৬
জিহাদের সারকথা	৫২
জিহাদের হুকুম	৫৩
সন্ত্রাসবাদ	৬৩
পাশ্চাত্য দর্শনে সংজ্ঞায়ন	৬৪
ইসলামে সংজ্ঞায়ন	৬৫
ইসলামে সন্ত্রাসবাদের সারকথা	৭২
মডারেট মুসলিম-সমাজ ও জিহাদ বিষয়ক সংশয়	৭২
শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ	৭৩
জিহাদের সমপরিমাণ সাওয়াব	৭৫
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাই জিহাদ	৭৬
জিহাদে আকবার বা উত্তম জিহাদ	৭৭
জিহাদ কি ইক্বদামী,না শুধুই দিফায়ী?	৭৮
বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বাস্তবতা	৮০
পরিশিষ্ট	৮৩
রেফারেন্স	৮৪

প্রারম্ভিকা

بسم الله والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ، وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد.

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি সৃষ্টি করেছেন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন আর তিনিই সর্বোত্তম বিধানদাতা। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এবং সম্মানিত করেছেন ইলমের নূর দ্বারা। অতঃপর মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের মনোনীত করেছেন নবী ও রাসুল হিসেবে এবং নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত করেছেন তার প্রিয় হাবীব সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আর আমাদের দান করেছেন শ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হওয়ার গৌরব। ফা-লিল্লাহিল-হামদ।

চলমান সময় ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য খুবই নাজুক একটা সময়। সাংস্কৃতিক ও সামরিক অঙ্গনে একযোগে ভাঙা গড়ার মহরা চলছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম জাতির উপর সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক সহ সম্ভাব্য সকল দিক থেকে ব্যাপক আগ্রাসন চালিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি শত্রুরা তাদের লক্ষ্যে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও সফল হয়েছে। যার পরিণতি আমরা এই শতাব্দীর মুসলিমরা ভোগ করছি। কিন্তু এই দ্বীন পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের মতো নয় যাকে সরযন্ত্র করে বা আগ্রাসন চালিয়ে মিটিয়ে দেয়া যাবে; এই দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিয়েছেন। তাই তিনি তার নির্বাচিত বান্দাদের মাধ্যমে তার দ্বীনকে অক্ষত অবস্থায় টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কুফফারদের চালানো মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের ফলাফল হিসেবে দ্বীনের বুনিয়াদি অনেক বিষয়ে অধিকাংশ মুসলমান ধোকায় পতিত হয়েছে। এমনই একটি বিষয় হলো 'জিহাদ' । ইসলামের এই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আজ সর্বোপরি ঘৃণ্য চক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ। আজকের সমাজে জিহাদ ও মুজাহিদিনের তৎপরতা রীতিমতো ভয়ংকর অপরাধ।

দুঃখজনক এই পরিস্থিতির কয়েকটি প্রধান কারণ হলো– ১. জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ২. মুসলমানদের এই বিষয়ে চরম উদাসীনতা, ৩. এক শ্রেণীর মুসলমানের (?) জিহাদের প্রতি চরম অনিহা, ৪. কাফির-মুশরিকদের অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও বিশ্ব-মানচিত্রে জিহাদি কার্যক্রম ও মুজাহিদিনে কিরাম সমহীমায় প্রতিষ্ঠিত এবং এই কাফেলার তৎপরতা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা কুরআন সুন্নাহর আলোকে জিহাদের বাস্তবতা বোঝার ও একে কেন্দ্র করে জন্ম নেওয়া সংশয়গুলো নিরসনের চেষ্টা করবো ওয়া মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

চিন্তার মাপকাঠি ও মানসিক দাসত্ব

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে, এতে তোমরা কোন বাচ্চার কানকাটা দেখতে পাও কি? এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করলেনঃ

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

’ ’ আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত দীন।” (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০: ৩০)। (বুখারী, মুসলিম)

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি প্রতিটি মানুষ আল্লাহর ফিতরাতের উপর ই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে পরিবার ও আশেপাশের পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একেকজন একেকরকম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। ধরে। শাইতান ও তার অনুসারীরা আল্লাহর বান্দাকে তার ফিতরাতের বিপরীতে নিয়ে তাকে পথভ্রষ্ট করতে সদা তৎপর থাকে। অতঃপর আল্লাহ মানুষকে শাইতানের চক্রান্ত থেকে সতর্ক করতে ও সত্য দ্বীনের উপর অটল রাখতে কিতাব নাজিল করেন ও নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন সেই কিতাব দ্বারা মানুষকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করতে। বিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এবং অবিশ্বাসীরা শাইতানের চক্রান্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

একজন চিন্তাশীল মানুষের উচিত নিজের মনস্তত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করা। আমি কার মতো বা কাদের মতো চিন্তা চেতনা লালন করছি? আমি যদি একজন বিশ্বাসী হই, যদি আল্লাহ্, তার প্রেরিত রাসূল ও নাজিলকৃত কিতাবে ইমান এনে থাকি এবং তার কাছেই দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিদানের আশা রাখি তাহলে আমাকে প্রতিটি বিষয়ে তেমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে যেমনটা রেখেছেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণ। আর যদি

এমনটা হয় আমি নিজেকে মুমিন দাবি করছি আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখছি অথচ আমার চিন্তা চেতনা একজন কাফিরের মতো, আমি প্রতিটা বিষয়কে বিচার করছি কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাহলে তা নিজেকে কেবল ধোকা দেওয়ার ই নামান্তর।

অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বাস্তবতা হলো আমরা প্রজন্মগতভাবে মানসিক দাসত্বের স্বীকার। আমরা এমন একটা সমাজব্যবস্থায় বড় হয়েছি যেখানে আমরা মুসলমান বাবা-মার ঘরে জন্ম নিলেও আমাদের চিন্তা-চেতনা একজন প্রকৃতার্থে মুসলিমের চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। ইসলামের দৃষ্টিতে বা একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে কোনো কিছুকে বিচার করা আমাদের জন্য সহজ না। কারন আমাদের চিন্তার মাপকাঠি থেকে ইসলামকে সরিয়ে অন্য এক দর্শন কে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি সেই দর্শন? কি সেই দর্শনের ভিত্তি? প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে এবং পরবর্তী তাত্ত্বিক আলোচনা বোঝার সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে ইতিহাসের আলোচনা করবো।

ইতিহাস পর্যালোচনা

আল্লাহর দ্বীন: অনুসারী ও পথভ্রষ্টদের ইতিহাস

পৃথিবী ও মানব ইতিহাসের শুরু থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বহু জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং নবী-রাসূলগণের মধ্যমে তা শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর যখন সেসব কওম আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে তখন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এমন অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন-

'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের পূর্ব যুগের বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। আর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে তাদের রাসূলগণ এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনার মত লোক ছিল না। এভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে বদলা দিয়ে থাকি। অতঃপর তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে যমীনে

প্রতিনিধিত্ব দান করলাম। যাতে দেখতে পারি কিভাবে তোমরা কাজ কর' (ইউনুস ১০/১৩-১৪)।

"-أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِيْنَ

'আমরা কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি? অতঃপর আমরা তাদের অনুগামী করব পরবর্তীদের। অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপ আচরণই করে থাকি' (মুরসালাত ৭৭/১৬-১৮)।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে পৃথিবীতে নবি-রাসূল পাঠানোর ধারা পূর্ণতা পেয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে মুহাম্মাদ ﷺএর আনীত সত্য দ্বীনের অনুসারী ব্যতীত পূর্ববর্তী কিতাবপ্রাপ্ত দুই জাতি অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা রয়েছে। এমনটা নয় যে ইয়াহুদীরা মূসা আলাইহিস সালাম এবং খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম এর আনীত আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃত অনুসারী; বস্তুত তারা এক সময় আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং পরবর্তীতে রাসূলগণকে অস্বীকার করার দ্বারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এক জাতি হচ্ছে কুরআনের ভাষায় পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান) আরেক জাতি গজবপ্রাপ্ত (ইয়াহুদী)।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়–

কুরআনুল কারীমে যাদেরকে বনী ইসরাইল বলে সম্বোধন করা হয়েছে তারা হচ্ছে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কওম(জাতি)। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছিলেন ঈসা আলাইহি সালামের ছেলে এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নাতি। মুসা আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তাদের উপর তাওরাতের বিধান নাজিল করা হয়। মূসা আলাইহিস সালাম এর ওফাতের পর তার কওমের (বনী ইসরাইল) মধ্যে নানা প্রকার গোমরাহি ছড়িয়ে পরতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের জন্য ধারাবাহিকভাবে নবী রাসূল পাঠাতে থাকেন যাদের মধ্যে দাউদ আলাইহি সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও ছিলেন। সুলাইমান আলাইহি সালাম বনি ইসরাইলের বনি ইয়াহুদা কবিলার

সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার ইন্তিকালের পরে তার কবিলা বনী ইয়াহুদা হুকুমত শুরু করে। কিন্তু অন্য কবিলাগুলো তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ফলে ফিলিস্তিনে তারা দুই অংশ বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশের নাম ছিল উক্ত কবিলার দিকে সম্পৃক্ত করে ইয়াহুদা(Judah), অন্য অংশ ছিল সামারিয়া বা ইসরাইল(Israel)। পরবর্তীকালে বনু ইয়াহুদা সামারিয়া হুকুমতকে দখল করে পুরো ফিলিস্তিনে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে যার পর থেকে বনী ইসরাইলের নাম ইয়াহুদি হয়ে যায়।

সেই সময় অন্যান্য গোমরাহির পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ফিতনা ছিল ধর্মীয় অঙ্গনে উলামায়ে সু' তথা ভ্রান্ত আলিমদের আবির্ভাব হওয়া আর সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করা। লোকেরা সেই গোমরাহ আলিমদের অনুসরণ করে নবীদের বিরোধিতা শুরু করে, যেমনটা কুরআনে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে যায় যে তারা নবীদের হত্যা করে কিতাবুল্লাহর মধ্যে বিকৃতি করা শুরু করে। সে সময় আল্লাহ তা'আলা একজন নবী পাঠান যিনি ছিলেন আরমিয়া আলাইহিস সালাম। যিনি বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তায়ালা শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং তারা যদি ভ্রষ্টতা বন্ধ না করে তাহলে তাদের উপর এক জালিম বাদশা চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখান। কিন্তু বনি ইসরাইল তাদের এই নবীর কথায় সতর্ক হয়নি। ফলে আল্লাহ তায়ালা বাবেলে (বর্তমানের ইরাক) বসবাসকারী আসিরিয়ানদের বাদশা 'বখতে নসর' কে তাদের উপর চাপিয়ে দেন যে লক্ষ লক্ষ ইসরাইলিকে হত্যা করে এবং বাকিদেরকে গোলাম বানিয়ে নিজের সাথে ইরাকে নিয়ে যায় এবং বায়তুল মুকাদ্দাস এর প্রত্যেকটা ইট ধ্বংস করে দেয়।

বনি ইসরাইলের কাছে আল্লাহর কিতাব ছিল তাওরাত, যা একটি পরিপূর্ণ শার'ইয়াহ। তাদের কাছে দ্বীনের দ্বিতীয় উৎস ছিল নবীগণ এবং তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সহিফা ও কিতাবসমূহ। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় সেগুলো তাদের উপর নাযিল করেছেন যার মধ্যে যাবুর ও ইঞ্জিল অন্তর্ভুক্ত। তখন এগুলো ব্যতীত আর কোন উৎস ছিল না। ইয়াহুদীদের ইতিহাস অনুযায়ী জেরুজালেম ধ্বংস করার সময় বখতে নসর তাওরাতের সমস্ত কপি জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। পরবর্তীতে

উজাইর আলাইহি সালাম আবার তাওরাতকে একত্রিত করেন। তার এই কাজের ফলে কিছুই ইয়াহুদী বাড়াবাড়ি করে তাকে আল্লাহর সন্তান ডাকা শুরু করে।

যখন তাওরাত তাদের সামনে অনুপস্থিত ছিল, সেই সুযোগে ভ্রান্ত আলিমরা মানুষকে ওহির মূল শিক্ষর পরিবর্তে নিজেদের পক্ষ থেকে বানানো কথা শিক্ষা দেওয়া শুরু করে। দিনের উৎস যা ছিল তাওরাত তার পরিবর্তে আলেমরা নিজেদের বানানো কাহিনী বর্ণনা শুরু করে। এ সময় তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তালমুদ রচনা করে একে তাওরাতের স্থলাভিষিক্ত করে।

তারা মুসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের মধ্যে তাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন ও অপব্যাখ্যা করে। আর মানুষেরা এসব উলামায়ে সু' দের অনুসরণ করে নবীদের বিরোধীতা এমনকি তাদের হত্যা পর্যন্ত করে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সূরা তাওবার তাফসীরে লিখেছেন, বনি ইসরাইল তাদের আলিমদের আনুগত্য করে তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছিল এবং তাদের সমস্ত কথা কে ওহির সমপর্যায়ের গণ্য করে অনুসরণ করতো।

এভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে ইয়াহুদী জতিতে রূপান্তরিত হয়। তখন পুনরায় তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাদের মধ্যে তার আরেক রাসূল ঈসা আলাইহি সালামকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু মাগদ্বুব কওম তাদের তাদের দুর্ভাগ্যকে সম্প্রসারিত করতে আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম কে হত্যার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করলো আল্লাহ তার কুদরতে ঈসা আলাইহিস সালাম কে তার কাছে তুলে নিলেন আর তারা তার বদলে তার এক হাওয়ারিকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করলো।

ঈসা আলাইহিস সালাম কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসকে তারা দুই ভাগে ভাগ করে থাকে

১.ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার

২. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

ঈসা আলাইহিস সালাম কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার ৭০ বছর পর থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত সময়কালকে তারা ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলে থাকে। আর ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী সময়কে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলে যা এখনও অবধি চলমান রয়েছে।

ঈসা আলাইহিস সালাম কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের সরযন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর ইয়াহুদীরা নতুন সরযন্ত্র শুরু করে সেইন্ট পৌল নামক জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে; যার পূর্ব নাম সাউল। সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর জীবদ্দশায় ছিল একজন ইয়াহুদী এবং এবং তার আনীত শিক্ষার কঠিন বিরোধী। সে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করে ঈসা আলাইহিস সালাম এর হাওয়ারীদের সাথে মিলে দ্বীন প্রচারে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সময় সাথে সাথে সে সত্য দ্বীনে বিকৃতি ও নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মানুষও তার বিকৃতী গ্রহণ সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। চতুর্থ সতাব্দিতে রোমান বাদশা কনস্টান্টাইন সেইন্ট পৌলের বিকৃত খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করে একে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বানিয়ে দেয় এবং এর মাধ্যমে সত্য দ্বীন মানুষের দৃষ্টি থেকে পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যার আর এভাবে খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়।

ইসলাম

পরবর্তীতে এই দুই জাতিসহ সমগ্র বিশ্বের হিদয়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেন তার প্রিয় হাবীব রাহমাতুল-লিল-আ'লামীন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তী জীবন দুই অংশে বিভক্ত ছিল-

১. মাক্কী জীবন

তিনি এ অধ্যায়ে হিকমাহ্ ও দরদের সাথে মানুষকে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু এই অধ্যায়ে ইসলামের প্রচার শুধু মৌখিক দাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল। মাক্কী দাওয়াতি জীবন ছিল ১০ বছর। প্রথম তিন বছর দাওয়াত চলে গোপনে নিকটাত্মীয় ও পরিচিতদের মধ্যে। পরবতর্তী সাত বছর তিনি প্রকাশ্যে মানুষকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। এ সময় ইসলাম গ্রহণ করা মানুষের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প।মৌখিক দাওয়াতের এ সময়টা ইসলাম ছিল অনেকটা কোনঠাসা অবস্থায় আর মুসলিমরা ছিল নির্যাতিত। সমাজের ক্ষমতাধর মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলাম গ্রহণকারীদের নানভাবে নিপীড়ন করতো। সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নির্যাতনেন মাত্রা কম-বেশি হতো। এভাবে মক্কায় ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে আসলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইয়াসরিবের(বর্তমান মাদিনা) ভূমিকে তার দ্বীনের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

"হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর।"[৩]

২.মাদানি জীবন

এ অধ্যায়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের জিহাদ বা সশস্ত্র সংগ্রামের অধ্যায় বলা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺমক্কায় থাকা অবস্থায় শেষ বছর গুলোতে মদিনার কিছু কাফেলা হজ্জের মৌসুমে মক্কায় যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺতাদের সামনে ইসলামকে পেশ করলে তদের কিছু সংখ্যক লোকের হৃদয় আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মাদিনায় ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকেদের ইসলমের দাওয়াত দিতে থাকেন। মাক্কী জীবনের শেষ হজ্জের মৌসুমে তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺমাদিনায় হিযরত করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন এবং তার নিরাপত্তা ও আনুগত্যের বাইয়াত নেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺআবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে সাথে নিয়ে মদিনায় হিযরত করলে সেখানের মুসলিমরা তাকে অতি সম্মানের

সাথে গ্রহণ করেন এবং তাকে মদিনার নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন। এভাবে ইয়াসরিব হয়ে যায় ইসলামের প্রথম ইমারাহ্ যেখান থেকে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে; যেটা মক্কায় থাকা অবস্থায় সম্ভব হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺএখানে তার মুবারক নেতৃত্বে মুসলিমদের একত্রিত করেন, মুসলিম বাহীনিকে সংঘবদ্ধ করেন এবং তাদের দাওয়াত ও জিহদের নীতিমালা শিক্ষা দেন। ছোট ছোট বাহিনী তৈরী করে ইয়াসরিবের পাশ্ববর্তী অঞ্চল এবং মক্কার বানিজ্যিক কাফেলাগুলোর যাতায়াতের রাস্তায় প্রেরণ করেন। এই বাহিনীগুলো প্রেরণের উল্লেখযোগ্য একটা কারন ছিল ইসলাম যে এখন আর দুর্বল অবস্থায় নেই, মুসলিমদের যে নিজস্ব শক্তিশালী বাহিনী ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে এবং তারা যে যেকোনো আক্রমণ মোকাবেলা করার সক্ষমতা রাখে তা ইসলামের শত্রুদের দেখানো অথবা বলা যায় ইসলামের শত্রুদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিহাদী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তার সাহাবাদের খিলাফাত কালে এরূপ যুদ্ধের বহু নজির রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এ সময় দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদের অনুমতি ও আদেশ দেন। এ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার তার সাহাবাগণ দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর তার সাহাবাগণ দাওয়াত ও জিহাদ এর মুবারক ধারা জারি রাখেন এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃত ব্যতীত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় ই তার আনীত দ্বীনের মধ্যে একাধিক একাধিক ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, যার মধ্যে মিথ্যা নবী দাবিদারদের ফিতনা অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তার জীবনের শেষভাগে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একাধিক ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবি করে। তুলায়হা আসাদী, সাজাহ বিনতুল হারস, মুসায়লামা কাযযাব এদের মধ্যে অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ফিতনার মুলোৎপাটন করেন। এ সময়ের আরেকটি

ফিতনা ছিল মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের ফিতনা। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যারা সরাসরি ধর্মত্যাগ করে তাদের হত্যার আদেশ দেন ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ সময় মুরতাদদের পাশাপাশি আরেক শ্রেণীর লোকের প্রতিও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তারা ইসলামের অন্যতম ফরয বিধান যাকাত আদায়ে অস্বীকার করে। তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় যাকাত আদায়ে অস্বিকৃতি জানিয়েছিল কিন্তু অবশিষ্ট ইসলাম ধর্মকে তারা অস্বীকার করেনি। এতদা সত্ত্বেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর খিলাফতের দায়িত্ব চলে যায় উমার ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে। তিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন তেমনই আল্লাহর শত্রুদের ছিল প্রচণ্ড কঠোর। তার সময়ে ইসলমি খিলাফাহ সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। জিহাদের বরকতে তিনি আরবের বাইরেও একাধিক ভুখন্ড বিজয় করেন। এসময় সমগ্র পারস্য, সিরিয়া, আর্মেনিয়া ও মিশর, ককেসাস, পূর্ব আনাতোলিয়া, লিবিয়া, আজারবাইজান প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামি খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা গৌরবের সাক্ষর বাইতুল আক্বসা বিজিত হয় উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই।

তার ওফাতের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে বর্তমান লিবিয়া থেকে পূর্বে সিন্ধু নদ এবং উত্তরে আমু দরিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ২৩ লক্ষ বর্গ মাইলেরও বেশি। যা সেই সময়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল। জনৈক কৃতদাসের ছুরিকাঘাতে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরেকজন প্রিয় সাহাবি তার দুই কন্যার জামাতা উসমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

খারিজি: অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের সূচনা–

এই অধ্যায়টা ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়। খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে এক ভয়ানক ফিতনার সূচনা হয়। সানআ অঞ্চলের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নামক জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে সে নিজেকে মুসলিম ও বড় একজন আলিম দাবি করে। সে বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে গোমরাহি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সে মুসলিমদের কাছে যেয়ে তাদের বোঝাতে থাকেন যে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তুলনায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফাতের অধিক হক্বদার। পাশাপাশি সে খলিফার বিরুদ্ধে আরো বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ আনতে থাকে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে লোকদেরকে খলিফার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তার দীর্ঘ সরযন্ত্রের এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘর অবরুদ্ধ করে। চল্লিশ দিন অবরোধের পর তারা খলিফার গৃহে প্রবেশ করে কুরআন তিলাওয়াতরত খলিফাকে শহিদ করে দেয়।

উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। এবার এসে ষরযন্ত্রকারীরা নিজেদের রূপ পাল্টে ফেলে। হত্যাকারীরাই এবার হত্যার প্রতিশোধের দাবি তুলে। খলিফা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মাদিনার অভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নর প্রেরণ করা ইত্যাদি কাজে মনোযোগী হন যার ফলে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কিসাস গ্রহণে সাময়িক দেড়ি হচ্ছিলো। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা রাজ্যের লোকদেরকে খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কে দেয়। তাদের ধারাবাহিক ষরযন্ত্রের ফলস্বরূপ খিলাফাতের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা বাড়তে থাকে, উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধের মত ভয়াবহ যুদ্ধের সৃষ্টি হয় এবং এতে তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেক সাহাবী শহীদ হন। অপরদিকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরের কাছে বাইয়াত চেয়ে বার্তা পাঠান। কিন্তু শামের গভর্নর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার

কিসাস আদায় না হওয়া, খলিফার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ এসব ঘটনা অবলোকন করে বাইআত প্রদানে বিলম্ব করছিলেন। এই পরিস্থিতি এক পর্যায়ে আলী ও মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। ষড়যন্ত্রকারী দলও এই সময় যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে যুদ্ধ বন্ধ ও মধ্যস্থতা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপরের অংশটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমর ইবনুল আ'স ও আবু মুসা আশারী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নির্ণয় করা হয়। উভয়ে সিদ্ধান্ত জানান– আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা হওয়ার ব্যাপারটি মুসলিম উম্মার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।বাকি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা উভয় নেতার হাতেই থাকবে। যে যার অধীনে সে শাসন করবে। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যৌক্তিক কারনে এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন করেন এবং পুনরায় তার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। কিন্তু তার বাহিনীর বিশাল একটা অংশ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বদলে বিস্ময়কর এক বিভক্তির জন্ম দেয়। ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল মধ্যস্থতার মূল প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ তারাই ইতিপূর্বে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেছিল। তারা বাহিনী থেকে বিছিন্ন হয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং মধ্যস্ততার প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় আলী, মু'আবিয়া আমর ইবনুল আ'স আনহুমকে কাফির সাব্যস্ত করে।

বিচ্ছিন্ন এই বাহিনী কুফর হারুরা নামক গ্রামে অবতরণ করে। এজন্য এদেরকে হারুরিয়া নামেও অভিহিত করা হয়। তবে তাদের প্রসিদ্ধ নাম খারিজী। খারিজী নামের আভিধানিক অর্থ যারা বের হয়ে গেছে। তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ফলে তাদেরকে খারিজী নামে অভিহিত করা হয়।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য ফকিহ সাহাবীগণ তাদেরকে এই বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা ছিল চরম পর্যায়ে নির্বোধ বেদুইন গোষ্ঠী।

দলিল প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খারেজিদের বোঝানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে আলী রাঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। এতে অনেকে নিহত হন এবং বাকিরা পালিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে খারিজিরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে নিজেদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয় । ষরযন্ত্রের ফলস্বরূপ গুপ্ত হামলার মাধ্যমে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে। মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপরও তারা হামলা করে কিন্তু ভাগ্যক্রমে তারা বেঁচে যায়।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের পর মদিনাবাসী তার ছেলে হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহনের অনুরোধ জানান এবং তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফাতের দায়িত্ব তাকে হস্তান্তর করার দাবি জানান। সংঘাত এড়াতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দাবি মেনে নেন এবং মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাফাতের দায়িত্ব দিয়ে দেন। এভাবে খুলাফায়ের রাশিদার খিলাফাতের পর মু'আবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে উমাইয়া খিলাফতের সূচনা হয়। এরপর বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়ে ইসলামিক খিলাফাতের বরকতময় ধারা চলমান থাকে; ১৯২৩ সালে উসমানী খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে যার সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমান বিশ্ব:

ইসলামী খেলাফতের পতন এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টি এক শয়তানি চক্রান্তের নির্মম ফলাফল। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা ছিল এই চক্রান্তের মাস্টার মাইন্ড। তাদের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের বহু পূর্বেই তারা তাদের দ্বীনের মূল বিধানে পরিবর্তন এবং

দ্বীনকে বিকৃত করে ফেলেছিলো। তবুও আল্লাহকে সর্বোচ্চ বিধানদাতা ও নিজেদের আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানতো।অর্থাৎ যদিও তারা বিকৃত ধর্ম পালক করতো তদুপরি তারা ধার্মিক ছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা একটা পুরদস্তর ধর্মহীন বিশ্বব্যবস্থা এবং যাদের হাতে এই ব্যবস্থার সৃষ্টি সরাসরি আল্লাহর হুকুমাতের অস্বীকারকারী। এই অবাধ্যতার ধারাবাহিকতা তুলে ধরা হলো:–

ধর্মহীনতার দর্শন

ইসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের তিনশ বছর পূর্বে ইউরোপের ইউনান বা গ্রিক অঞ্চলে একটি মতাদর্শ প্রচারিত হয়, যা ইলমে ওহি ও মানুষের বুদ্ধির মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলার ভাবনা ও ইলমে ওহির দিকনির্দেশনা ব্যতীত শুধু মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের জন্ম দেয়। যাদের মধ্যে এরিস্টটল ও প্লেটো অনেক প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। এই দার্শনিকদের বিশ্বাসগুলো ছিল আসমানী কিতাবগুলোর আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক, বিশেষ করে তাকদিরের আকিদার বিপরীত।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কেউ অসুস্থতায় মারা গেলে ধর্মের দেওয়া বক্তব্য ‘সব আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছাতেই হয়েছে’ তা ভুল কারণ তার কাছে যদি টাকা থাকতো এবং সে চিকিৎসা করাতো তাহলে সে বেঁচে যেত। তারা বলে, ধর্ম মানুষকে আফিমের মতো নেশাগ্রস্ত করে রাখে। মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে নিজেই নিজের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু ধর্মের শিকল মানুষের এই কাজের অনুমতি দেয় না তাই তাদের ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের কথায় প্ররোচিত হয়ে মানুষ নিজে সমস্যাগুলো সমাধানে আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীতে নতুন শিক্ষা ও দর্শন গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে বিষ ঢালা শুরু করে এবং মানুষকে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করার দিকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে

মনগড়া পথে প্রচলিত করতে থাকে। আর এখান থেকে মানুষের সব সমস্যা শুধু বুদ্ধি দ্বারা সমাধানের এক নতুন চিন্তাধারা ও দর্শনের জন্ম নেয়।

শুরুতে এই দার্শনিকদের গোমরাহ মতাদর্শ কোনো সমাজেই স্থান পায়নি; চাই তা ইহুদি সমাজ হোক বা হিন্দু সমাজ। বরং তাদেরকে ধর্মহীন ও ধর্ম বিরোধী আখ্যা দিয়ে খুব কঠোরতার সাথে দমিয়ে রাখা হয়। খলিফা মামুনুর রশিদের দারুল হুকুমত যখন গ্রীক দর্শনের বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করানো শুরু করে তখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই দর্শন এই সমস্ত দর্শনের প্রচার শুরু হয়। এই অনুবাদ গুলোর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মু'তাজিলা ফিতনার উৎপত্তি হয়। শুধু মানুষের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আকাইদ ও ইলমে কালামের নতুন নতুন আলোচনা সামনে আসতে শুরু করে যা উম্মতের মধ্যে নতুন সব ফিতনার দরজা খুলে দিতে থাকে। হকপন্থী আলিমগণ এই সমস্ত ফিতনা খুব ভালোভাবে মোকাবিলা করেন এবং দলিলের মাধ্যমে এগুলো বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। কিন্তু অপরদিকে কয়েক যুগ পর পশ্চিমা খ্রিস্টানদের মাঝে এই সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফরাসি বিপ্লব ছিল এই সমস্ত চিন্তারই ফসল আজ এই ধর্মহীনতার দর্শন ই পুরো দুনিয়াতে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।

ধর্মহীনতার আন্দোলন–

গ্রিক দর্শনের ভিত্তি ছিল আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার ও ইলমে ওহীর বিপরীতে মানববুদ্ধিকে অগ্রগামী প্রমাণ করা। গ্রীকের ধর্মহীন দর্শন মূলত ছিল ধর্মের বিরোধিতা। খ্রিস্টানরা শুরু থেকে এই দর্শনের মোকাবিলা করতে থাকে। একসময় পঞ্চম শতাব্দীতে যখন রোমান সাম্রাজ্যের এলাকাগুলোতে এই ফিতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন খ্রিস্টান ইতিহাসে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পাত্রী সেন্ট অগাস্টিন ময়দানে নেমে আসে। সে এই ফিতনাকে বিতর্ক ও প্রশাসনিক শক্তি দ্বারা প্রতিহত করে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেয়। কিছু খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের মতে সেন্ট অগাস্টিনই সেই ব্যক্তি যে ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে

প্রথমবার সেক্যুলার ও ধর্মবিরোধীতার পরিভাষা ব্যবহার করে। এরপর পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আনুমানিক নয়শো বছর খ্রিস্টান ইউরোপে আর ধর্মহীনতার ফিতনা মাথা উঁচু করার সুযোগ পায়নি।

কিন্তু এই সময়টাতে খ্রিষ্টান পাদ্রী ও বাদশাদের গির্জা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার মধ্যে অনেক অসংগতি প্রকাশ পায়। ঐতিহাসিকদের মতে এই সময় খ্রিস্টান পাদরিদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বাড়াবাড়ির ফলে ইউরোপে এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তাদের দাবি অনুযায়ী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বুদ্ধি,জ্ঞান ও স্বাধীনতার ওপর এই বাড়াবাড়ি সেক্যুলার ভাবধরার বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অপরদিকে গির্জা বাদশা ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সাধারণ জনগণের উপর এক জুলুম ও নির্যাতনের সাম্রাজ্য কায়েম করে রেখেছিল। জনগণের কষ্টের অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করে গির্জার পাদ্রী, বাদশা ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আলিশান জীবন যাপন করতো অথচ সাধারণ মানুষদের অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো। তাদের ফসল ছিনিয়ে নেওয়া হতো এবং তাদের প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত করা হতো না। এই জুলুমের ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও আন্দোলনের মনোভাব সৃষ্টি হয়। বাদশার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের এসব আন্দোলনে ছিল বর্তমান Human Rights বা মানবাধিকারের ভিত্তি। জনগণের ধারাবাহিক আন্দোলনের আন্দোলনের ফলে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে বাদশা ও জনগণের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাকে মেঘনা কার্টা চুক্তি বা স্বাধীনতার মহান দলিল বলা হয়। এই চুক্তিতে জনগণের অন্যান্য দাবির পাশাপাশি আরেকটি বিষয় ছিল জনগণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা যে কমিটির কাজ হবে শুধু জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদশা কে পরামর্শ দেওয়া। ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ এটাকে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ মনে করে। বাস্তবে এমনটাই হয়েছিল কারণ এই চুক্তির এক শতাব্দীর ভেতরেই বাদশা জন এর পৌত্র এডওয়ার্ড প্রথম পার্লামেন্টের ভিত্তি স্থাপন করে। মেঘনা কার্টা কে আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকা প্রত্যেকটা আইন ও মানুষের বানানো নীতিমালার উৎস ও

ভিত্তি মনে করা হয়। এই মেঘনা কাটাই আজকের মানবাধিকার আন্দোলনের শুরু যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে পশ্চিমাদের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আজও হচ্ছে। মেঘনা কার্টাই ছিল পশ্চিমে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে পড়ার মূল উৎস। বাদশাহর বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেক্যুলার ভাবধারার বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রসার করতে শুরু করে এবং জনগণের আন্দোলনকে তাদের আন্দোলনের সাথে একত্র করে ফেলে আর এই ধর্মহীনতা মানবাধিকার আন্দোলনের রূপ নেয় যা সময়ের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়ে যায়। এভাবেই মধ্যযুগে ইউরোপের খ্রিস্টান সমাজে ধর্মহীনতার আন্দোলন ও সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় এবং ইউরোপের রেনেসাঁর যুগে এর চূড়ান্ত উত্থান ঘটে।

সেক্যুলারিজম ও অন্যান্য

অভিধানের তথ্য অনুযায়ী সেক্যুলারিজমের অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা। বাহ্যিকভাবে সাধারণ মনে হওয়া এই শব্দের ভেতরে অনেক প্যাঁচানো দর্শন লুক্কায়িত রয়েছে। যাকে পশ্চিমা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা আলাদা একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়ে থাকে। যেন নিরপেক্ষতার নামে সে নিজেই 'ধর্মহীনতা'র একটি ধর্ম। এই দুর্বোধ্যতাই সেক্যুলারিজম-সংশ্লিষ্ট সমস্যা গুলোর একটি বড় সমস্যা।

দুর্বোধ্যতার প্রথম কারণ হচ্ছে, এটি মানুষের সেই অসম্পূর্ণবুদ্ধি থেকে আবিষ্কৃত, যার দাবি সে সৃষ্টিকর্তা থেকেও বেশি জ্ঞানের অধিকারী। (নাউযুবিল্লাহ) অর্থাৎ যেন সে নিজেই নিজের রব। এই দৃষ্টিতে এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত দিনের বিপরীতে মানব তৈরি ধর্ম বলা যায়।

দ্বিতীয় কারণ, সেকুলারিজম শুধু একজন ব্যক্তির একটি অসম্পূর্ণবুদ্ধির ফল নয়; বরং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অসম্পূর্ণবুদ্ধির সমষ্টি।

তৃতীয় কারণ, এ ধর্মের দার্শনিকরা অসম্পূর্ণ পথের পাশাপাশি চারিত্রিক দিক থেকেও চরম অধঃপতিত ছিল। যার স্বীকৃতি তারা নিজেরাই দিয়েছে এবং যার ব্যাপারে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়।

চতুর্থ কারণ, সেক্যুলারিজম শুধু এক বা দুই যুগেই পূর্ণ আকৃতি ধারণ করেনি; বরং তা খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালে রোমান ও গ্রীকের মুশরিক সমাজের গুহা থেকে বের হয়ে দুই হাজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের লম্বা সময় অনেক পরিবর্তনের ধাপ পাড়ি দিয়ে বর্তমান আকৃতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভিত্তিতে বলা যায় এটি ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল একটি ধর্ম।

পঞ্চম কারন, সেকুলারিজমের উন্নতির সবচেয়ে বড় কারণ খ্রিস্টান ধর্ম ও সমাজের জুলুমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে 'পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ধর্ম'ও বলা যায়।

মধ্যযুগের ইউরোপে এই ধর্মহীনতা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে ঐতিহাসিকরা তিনটি কারণ উল্লেখ করে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে মেঘনা কাটা চুক্তি, দ্বিতীয়টি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়টি প্যারিস ইউনিভার্সিটি থেকে কৃত দর্শনের শিক্ষকদের বহিষ্কার। প্যারিস ইউনিভার্সিটির এসব শিক্ষকদের গির্জার পক্ষ থেকে ধর্মহীন ঘোষণা করা হয়। কারণ তারা গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষার পর খ্রিষ্ট ধর্মের কিছু মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের চিন্তাধারাকে গির্জা কর্তৃক ধর্মত্যাগ নাম দেওয়া হয়েছিল। এ ধর্মহীন ব্যক্তিরা ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে আসে এবং সেখানে জনগণের মধ্যে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করে যারা গির্জার চিন্তা চেতনা ও শিক্ষা থেকে দূরে ছিল। পরবর্তী দুই শতকে মধ্যে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভার্সিটিগুলো ইউরোপে এমন হয়ে প্রসিদ্ধি পায় যে পূর্ব ইউরোপ সেখান থেকে জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে বাধ্য হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় দেড়শ বছর যাবত মুসলিম ভূখণ্ডে মুনাফিক বাহিনী তৈরি করে পাঠাচ্ছে; যারা মুসলিমদের মধ্যে কৌশলে তাদের অনুগত শ্রেণী তৈরী করে যাচ্ছে।

সেক্যুলারিজম এর কয়েকটি প্রকার ও একাধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রকার, যা বর্তমান যুগে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে হিউম্যানিজম বা মানব ধর্ম। এই হিউম্যানিজমই আজকের ধর্মহীনতার উৎস। human শব্দের স্বাভাবিক অর্থ মানুষ এবং হিউম্যানিজমের অর্থ মানব ধর্ম হলেও এর সৃষ্টি ইতিহাসের দিক দিয়ে এর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে গ্রিক দার্শনিকরা বাহ্যিক দুনিয়া নিয়ে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা শুরু করে। এই দার্শনিকদের কসমোলজিস্ট বলা হত। কসমোলজিস্টদের গবেষণা শুধু চন্দ্র, সূর্য ও তারকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েক বছর পর দার্শনিকদের আরো একটি দল তৈরি হয়, যাদের থিওরি ছিল, যেভাবে সূর্য চন্দ্র ও তারকার গতিপ্রকৃতি জানা সম্ভব হয়েছে তেমনি ভাবে মানব বুদ্ধির দ্বারাই রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা নির্ধারণ ও তৈরি করা সম্ভব। দার্শনিকদের এই দলটি সামাজিক বিষয় নিজেদের বুদ্ধি ভিত্তিক দর্শন পেশ করা। শুরু করে সময় পার হওয়ার সাথে সাথে তাদের হিউম্যানিস্ট বলা শুরু হয়। শেষ শতাব্দি গুলোতে হিউমানিস্ট সেই ব্যক্তিদের বলা হত যারা বিশ্বাস করত এখন দুনিয়াতে জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের কোন রবের প্রয়োজন নেই।(নাউজুবিল্লাহ) যদি ইলা থেকেও থাকে, তাহলে এখন আর তার কোন প্রয়োজন নেই বরং মানুষ নিজের বুদ্ধির উপর ভরসা করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নিতে সক্ষম হয়ে গেছে। আধুনিক যুগে হিউমানিজমের জনক হচ্ছে জন লক, ডেভিড হিউম, ফিডরিক নিৎসে, ভলতেয়ার রুশোর মতো দার্শনিকরা।

ইউরোপের রেনেসাঁ ও ফরাসি বিপ্লব

ইউরোপের ইতিহাসের তৃতীয় যুগ(১৪৫৩-১৭৮৯), যা আজকের আধুনিক পশ্চিমের আকৃতি ধারণ করেছে তাকে রেনেসাঁর যুগ বলা হয়। এই যুগের ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের পতন ও ধর্মহীনতার বিজয় শুরু হয়। তাই খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এই যুগকে রেনেসাঁর পরিবর্তে ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টির যুগ বলে থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগে যেহেতু ধর্মহীন ও সেক্যুলারদের শক্তি বেশি তাই এই পরিভাষা

ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়। ইউরোপের ঐতিহাসিক গণেশ ওকে বোঝানোর জন্য শব্দ ব্যবহার করেছে, যার বাংলা অর্থ নতুন জন্ম।

এই যুগের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ছিল ইউরোপের জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন। জনগণের মধ্যে এ চিন্তা গত পরিবর্তন দিনের প্রতি অসন্তুষ্টি থেকেই হয়েছিল যার ফলে তাদের মধ্যে ধর্মহীনতার চিন্তাধারা গ্রহণ করা হিড়িক পড়ে যায় যা পরবর্তীকালে যুক্তিবাদের আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়। এ যুগে গির্জার সংশোধন আন্দোলন আরও অধিক শক্তিশালী হয়,যা মধ্যযুগে ব্যর্থ হয়েছিল। সবশেষ মার্কিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন সফলতা লাভ করে এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট নামে একটি নতুন দল তৈরি হয়। পরবর্তী যুগে এই দলটি ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে শক্তিশালী হয়, যা আজও একই অবস্থায় টিকে আছে। এই দলটিকে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে সম্পর্ক ঐক্য স্থাপনকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। এ যুগে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় এবং এ রাষ্ট্রটি প্রটেস্ট এন্ড খ্রিস্টান ইহুদীদের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় অতঃপর এই রাষ্ট্রের মধ্যেই প্রথম ধর্মহীনতার বিপ্লব হয়, যাকে আমেরিকান রেভ্যুলেশন বলা হয়।

রেনেসাঁর যুগে ইউরোপের দেশগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে কোম্পানি পাঠায়। পরবর্তীকালে এই কোম্পানিগুলো হিন্দুস্তানের উপর ইংল্যান্ডের দখল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরিণত হয়। হিন্দুস্তানের উপর বৃটেনের এই দখল ছিল আন্তর্জাতিকভাবে পশ্চিমাদের উত্থানের মূল উৎস। এই যুগেই ব্যাপকভাবে ব্যাংক ও কাগজের নোটের প্রচলন ঘটে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমান আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ‘মার্কেট ইকোনমি’ বলা হয় যার ভিত্তি হচ্ছে এই ব্যাংক, কারেন্সি ও কোম্পানি। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হয়; যার ফলে আমেরিকা ও রাশিয়ার মাঝে ৪০ বছরের কোল্ড ওয়ার সংঘটিত হয়। রেনেসাঁর যুগে হোলি রোমান এ্যাম্পায়ার এর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি যুদ্ধ শুরু হয়, যা ৩০ বছর পর্যন্ত চলমান ছিল। এই যুদ্ধ মূলত রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সাম্রাজ্য

গুলোর মধ্যে হয়েছিল। এই যুদ্ধে হোলি রোমান এম্পায়ার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার অধীন রাষ্ট্রগুলো নিজে নিজেই স্বাধীন হয়ে যায়। এর ফলে আগে পুরো রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলোর উপর গির্জার ধর্মীয় অধিপত্য থাকলেও এবার রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে নিজ নিজ স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়নের পরিকল্পনা করে। এই যুদ্ধ শেষ হয় ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে আর এই চুক্তি আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের থিওরি সামনে আনে। দুর্ভাগ্যবশত ওসমানী খিলাফাতের পতনের পর এই সূত্রই আরব ও তুর্কি জাতীয়তাবাদের চেতনা মুসলিমদের মধ্যে তৈরি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ওসমানী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়, তখন এই থিওরির ভিত্তিতেই নতুন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অস্তিত্বে আসে। আজ মুসলিম উম্মাহ ৫৭ টি রাষ্ট্রের বিভক্ত। ৫৭ টি বাহিনী ও ৫৭ টি জাতীয়তা! এইসবের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আজকের নতুন দেশী ও রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, যা জাতিসংখ্যা গ্রহণযোগ্য, এখানে চারটি শর্ত রয়েছে। সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব, আবাদি,ভৌগলিক সীমানা এবং প্রশাসন। এসব গুলির ভিত্তি অভিশপ্ত ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি।

১৫৭৫-১৭৮৯ সালের এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আন্দোলনের দার্শনিকরা নিজেদের অসম্পূর্ণ বুদ্ধির ভিত্তিতে এই ফয়সালা দেয় যে, মানুষ স্বাধীনভাবে জন্ম নিয়েছে; কিন্তু ধর্ম ও বাদশাহরা এদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। ধর্ম একটি অন্ধকার, যা মানুষকে গুনাহ সওয়াব হারাম হালাল এবং আখিরাতে জবাবদিহির কথা বলে আবদ্ধ করে রাখে। এই অন্ধকারকে অস্বীকার করায় আলোকিত চিন্তা বা বুদ্ধির মুক্তি।

ইনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সমস্ত দার্শনিক চারটি মূলনীতির উপর ঐক্যমত হয়েছিল:

- প্রথমত, এই কথার উপর বিশ্বাস রাখা যে মানুষের যুক্তিই চূড়ান্ত দলিল।
- দ্বিতীয়ত, এই দুনিয়া প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নীতিমালার ওপর চলমান। (এখানে অদৃশ্য কারো হস্তক্ষেপ নেই)
- তৃতীয়ত, রাষ্ট্র শাসনের সব ধরনের ইলাহী বিধানের ক্ষমতা কে প্রত্যাখ্যান করা।

- চতুর্থত, সমাজের ধারাবাহিক উন্নতি। (উন্নতি তারা এখানে উন্নতির পশ্চিমা ধারা উদ্দেশ্য। যার মূল কথা হলো, নফসকে খুশি করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া। সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ করতে পারা)

এই আন্দোলনের সবচেয়ে প্রভাব ফেলে ভূমিকা রেখেছিল ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী কবি ভলতেয়ার। অতঃপর তার থেকেও বেশি লেখালেখি করেছিল আরেক দার্শনিক রুশো। রুশা ছিল ফ্রান্সের সেই দার্শনিক যার দর্শনের ভিত্তিতে আছে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলনের যুগ যদিও ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের পর শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের আরো অগ্রগতি ঘটে। কারণ এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন গির্জার পতন আধুনিক,সেক্যুলারিজমের উত্থান, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং মানবীয় সংশোধন মূলক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। আর এভাবেই পাশ্চাত্য 'উন্নতির' বিশ্বাস আরোও দৃঢ় হতে থাকে।

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ছিল রেনেসাঁর যুগের সর্বশেষ ঘটনা। যার পর পশ্চিমা বিশ্বের পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে পশ্চিমারা নতুন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ফরাসি বিপ্লব ছিল ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের শুরু। যার ফলে পোপতন্ত্র ও বাদশাহীর জায়গায় ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক সংবিধান ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ বিপ্লবের ফলে শুধু ইউরোপে নয়; বরং পুরো দুনিয়াতে চিন্তাগত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক দখল এ বিপ্লবকে বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে দেয়।

ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সমাজে তিনটি শূন্যতা তৈরি হয়:

- গির্জার নির্দেশনা ও ঐশী বিধান বিলুপ্তের ফলে বিধানদাতার দৃষ্টিভঙ্গিতে শূন্যতা।
- বাদশাহী বিলুপ্তের ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা শূন্যতা।
- দিন বিলুপ্ত হওয়ার ফলে নৈতিক মানদন্ডের ক্ষেত্রে শূন্যতা।

এই তিনটি শূন্য তাকে পূরণের জন্য সেক্যুলারিজম সামনে এগিয়ে আসে এবং পূর্বের চারশ বছরের শ্রমের ফল দ্বারা দুনিয়াকে নতুনভাবে শৃঙ্খলিত করে। বিধান প্রদান ও প্রণয়নের জন্য হিউম্যানিজমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। নৈতিকতা নির্ধারণের জন্য মানুষের বুদ্ধিকেই মূল মাপকাঠি বানায় এবং সমাজ পরিচালনার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মানুষের সাথে পরিচিত করায়। এই ছিল সেই মাইলস্টোন, যেখানে ওল্ড ওয়ার্ড অর্ডারের ইতিহাস শেষ হয়ে যায় এবং অভিশপ্ত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষড়যন্ত্রের কবলে মুসলিম উম্মাহ ও আল্লাহর সৈনিকদের প্রতিরোধ

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের শুরুর যুগকে মুসলিম ঐতিহাসিকরা উম্মার পতনের শুরু হিসেবে গণ্য করেন। পশ্চিমাদের উত্থান ও মুসলিম উম্মাহর পতনের পিছনে বড় একটা কারণ ছিল ইংরেজদের হিন্দুস্তান দখল। হিন্দুস্তান সে সময় ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদে ভরপুর উন্নত একটি রাষ্ট্র। ইংরেজরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে আসে। এরপর বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ফ্যাক্টরি বসায় ও গুদাম বানায়। এই ফ্যাক্টরি ও গুদাম গুলোকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজদের চৌকিদারের প্রয়োজন হয়। তাই বাদশাহের অনুমতিতে চৌকিদারের বাহিনী তৈরি করে। সময়ের সাথে সাথে যখন কোম্পানির কাজ পৃথিবীতে থাকে, তখন তাদের কোম্পানিকে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক অংশের নাম প্রেসিডেন্সি রাখা হয়। এগুলো ছিল 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি' 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সি' এবং 'বাঙ্গাল প্রেসিডেন্সি'। আস্তে আস্তে এই তিনটি প্রেসিডেন্সি নিজ নিজ বাহিনী বৃদ্ধি করে নিজেদের ঘাঁটিকে শক্তিশালী করা শুরু করে। অতঃপর যখন মোঘল বাদশারা দুর্বল হয়ে যায় তখন এই প্রেসিডেন্সিগুলো সেই সুযোগে হিন্দুস্তান দখলের চক্রান্ত শুরু করে দেয়। সর্বশেষ হিন্দুস্তানের উপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠার দ্বারা এ চক্রান্ত শেষ হয়।

হিন্দুস্তানে ইংরেজরা রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক উপনিবেশের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে পুঁজিবাদী চিন্তাধারার বীজ বপন করে দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বাদশা ও সেনাবাহিনীরা সম্পদ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার লোভে পড়ে ইংরেজদের দাসে পরিণত হয়।

এই ক্রান্তিকালে পথহারা মুসলিম উম্মাহর হাল ধরতে এগিয়ে আসেন ইসলামের এক মহান বীরপুরুষ। ইতিহাসে যিনি 'শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি' নামে পরিচিত। শিশুকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত তিনি দিল্লি দুরবস্থা লক্ষ্য করে আসছিলেন, যা দেখে কোন আলিমে রব্বানীর পক্ষে চুপ থাকা ছিল অসম্ভব। তাই তিনিও চুপ না থেকে কাজের ময়দানে নেমে আসেন। তিনি এক পরিপূর্ণ মানহাজ বা কার্যপদ্ধতি তৈরি করেন, যার দুটি মৌলিক বিষয় ছিল। প্রথমটি ছিল, হিন্দুস্তানের মুসলিমদের শক্তি যাতে দুর্বল না হয়ে যায় তাই মোঘল বাদশাদেরকে (যারা সে সময় অনেক শারিয়াহ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলেও হিন্দুস্তানে মুসলিমদের কেন্দ্রীয় হিসেবে বিবেচিত হতো) যেকোনোভাবে হোক সে সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখা, যতক্ষণ না কোন উপযুক্ত শার'ই নেতৃত্ব সামনে আসে। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল হিন্দুস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে শার'ইয়ার অনুগত করা। যেহেতু এই বিপ্লব এক দুই বছরের সম্ভব নয়; তাই তার কার্যক্রম ছিল এই বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসেবে আলিমদের এমন একটি দল তৈরি করা যারা জনগণ ও মুসলিমদের মধ্যে জিহাদের মানসিকতা জাগ্রত করবে। অতঃপর সেই জিহাদের বদৌলতে সমাজে পরিবর্তন ঘটবে।

এই কর্ম পদ্ধতিতে কাজের জন্য তিনি দুটি জামাআত তৈরি করে শাসক ও আলিমদের উপর আলাদাভাবে কাজ শুরু করেন। তার প্রচেষ্টার ফলে ১৭৬১ সালে আফগানের শাসক আহমদ শাহ আবদালী তার বাহিনী নিয়ে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মিরাঠি বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু অপরদিকে এই সময় ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে নেয়। ইংরেজদের বাংলা দখল করে নেওয়া শুধু হিন্দুস্তানের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত মোড়ই

ছিল না; বরং এটি বৈশ্বিকভাবে পশ্চিমাদের উত্থানের জন্য আরো একটি শক্তিশালী সিঁড়ি হিসেবে পরিগণিত হয়।

বাংলা শাসক হওয়ার পর ইংরেজরা সেখানে নিজেদের আইন-বিধান বাস্তবায়ন করা, মানুষকে শাস্তি দেওয়া, স্বাধীন ব্যবসা করা এবং ট্যাক্স উসুলের ক্ষমতা পেয়ে যায়। এর পূর্বে যেহেতু বাংলায় শার'ইয়া বাস্তবায়িত হতো এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা হতো; বাংলার বাণিজ্যিক সমস্ত নীতিমালা জনগণের ফায়দার জন্য বানানো হয়েছিল; তাই এ নীতিগুলোর দ্বারা ইংরেজদের কোন উপকার হচ্ছিল না। ফলে তারা সে নীতিগুলো পরিবর্তন করে বাংলায় নিজেদের পূর্ণ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে এবং হিন্দুস্তানে ইংরেজদের আইন বাস্তবায়ন শুরু করে দেয়।

ইংরেজরা কখনোই সর্বদা হিন্দুস্তানি হয়ে থেকে যাওয়ার কল্পনা করেনি। যদি করেও থাকে তাহলে হিন্দুস্তানের চলমান জিহাদী আন্দোলন তাদেরকে সর্বদা এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করত যে তাদেরকে অবশ্যই একদিন এই রাষ্ট্র থেকে বের হতেই হবে। তাই তাদের কাজ ছিল হিন্দুস্তান থেকে অধিক থেকে অধিক সম্পদ নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি তারা এটাও জানতো, এমনটা করলে হিন্দুস্তানের শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে; ফলে হিন্দুস্তানে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিরোধিতা শুরু হবে। তাই এখানকার রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে নিজেদের সাহায্যকারী দল গঠনে তৎপর হয়।

ইংরেজদের সেই সময়কার জেনারেল লর্ড লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস হিন্দুস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে থেকে এমন একটি বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা করে যারা কোন ধর্মের আদর্শ ছাড়াই যুদ্ধ করবে এবং তাদের জান কুরবান করবে। পাশাপাশি ইংরেজরা যখন কোন আইন পরিবর্তন করবে তখন কেন এটা করেছে তা চিন্তা করার সক্ষমতা সেই সিপাহির মধ্যে থাকতে পারবে না। যারা শুধু তাদের ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির হিসাব করবে। পাশাপাশি সিপাহীরা ইংরেজদের পূর্ণ ওয়াফাদার হবে। কোন ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াই যুদ্ধ কিভাবে হবে এবং আঞ্চলিক জনগণের ওয়াফাদারি কিভাবে অর্জন করবে? এ প্রশ্নের জবাবে ইংরেজদের বক্তব্য ছিল, যদি কোন সিপাহী ইংরেজদের ওয়াফাদার হয় তাহলে তাকে বাহিনীতে প্রমোশন দেওয়া হবে। মূলত তাদেরকেই

পেশাদার ভাড়াটে সিপাহি বলা হয়; বরং সঠিক শব্দে তাদেরকে পেশাদার বাড়াতে হত্যাকারী বলা যায়। এটাই পরবর্তী উপমহাদেশের বাহিনীর আদর্শিক চিন্তাগত ভিত্তি।

ইংরেজরা তাদের এই জঘন্য পরিকল্পনায় সাময়িক সময়ের জন্য হলেও সফল হয়েছিল। হিন্দুস্তান থেকে পাওয়া তাদের এই ভাড়াটে বাহিনী বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক উত্থানের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হয়েছিল।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, যখন হিন্দুস্তানে মুসলিমদের কোন প্রভাবশালী শক্তি ছিল না, এই অবস্থায় দিল্লির একদল আলিম তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ কমান্ডারের নেতৃত্ব পর্যবেক্ষণ করছিল। তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ এর সন্তান আলিমের রব্বানী আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি (রহিমাহুমাল্লাহ)। যিনি প্রায় অর্ধশতাব্দি যাবত পিতার চিন্তাধারা অনুযায়ী এমন এক বাহিনী প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন, যারা একদিকে আবারও জিহাদের ময়দানে ইংরেজ শক্তির মোকাবিলা করবে অপরদিকে সমাজ সংশোধনের দ্বারা সমস্ত শিরক বিদআত ও কুসংস্কার কে দূর করবে। তৃতীয় দিক থেকে মুসলিমদের জন্য এমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে যে নেতৃত্ব সমস্ত পথভ্রষ্ট ও কাফির বাদশাহ, যারা নিজেদের স্বার্থে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে মিল লড়াই করতো তাদের হটিয়ে সেই স্থানে খিলাফাত আলা মিনহাজিন নাবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করবে।

শাহ আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ১৮০৬ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ফাতওয়া প্রকাশ করেন। যা ছিল হিন্দুস্তান অঞ্চলের শার'ই অবস্থান পরিবর্তনের ঘোষণা। তিনি সেই ফাতওয়ায় হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলামের পরিবর্তে দারুল হারব ঘোষণা করেন। শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না; বরং ফাতওয়ার ভিত্তিতে যে শুরুই হুকুম স্পষ্ট হয়েছে তা বাস্তবায়নে পরিকল্পনা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন।

শাহ আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ-র ফাতওয়া হিন্দুস্তানের মুসলিমদেরকে দুই ধরনের দিকনির্দেশনা দেয়। প্রথম নির্দেশনা এ ফাতওয়ার মূল ইবারত থেকে পাওয়া যায়। তা

হলো, এখন হিন্দুস্তানের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এটি দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারব হয়ে গেছে। দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো, ফাতওয়া মুতাবিক সেসব কার্যক্রম, যা আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ জিহাদ সংঘটিত করার জন্য করেছিলেন। অর্থাৎ এই দারুল হারবকে আবার দারুল ইসলাম বানানোর কার্যক্রমের সূচনা। উপমহাদেশের মুসলিমদের এই অধঃপতনের যুগে আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের নিকট আজও সেই ফতওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা সেই যুগে ছিল। এই ফাতওয়া আমাদেরকে শার'ইয়ার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও চিন্তগত দিক-নির্দেশনা দেয়।

হিন্দের ঐতিহাসিকগণ সকলে একমত যে,শাহ আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া ছিল হিন্দুস্তানকে ইংরেজদের থেকে আজাদ করে আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদের ভিত্তি। এই ছিল সেই ছায়াদার বৃক্ষের শিকড়, যার ছায়াতলে হিন্দের সমস্ত ঈমানদার মুসলিম নিজেদের ঈমান বাঁচানো ও দ্বীন বিজয়ের চেষ্টায় অংশ নেয়। ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারেও একমত যে, এই ফাতওয়া সাধারণ মুসলিম ও আলিমদের সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এই ফাতওয়ার পর হিন্দের মুসলিমদের সমস্ত সামাজিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হয়ে যায় হিন্দকে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে পরিবর্তন করা। এই ফাতওয়াকে সামনে রেখে দিল্লির আলিম সাইয়িদ আহমদ শহীদ, শাহ্ ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা আব্দুল হাই রাহিমাহুমুল্লাহ এবং পাঠনার আলিম মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী রাহিমাহুমাল্লাহ জিহাদ করেছেন। ১৮৫৭ সালে আজাদির যুদ্ধে আকাবিরে দেওবন্দ মাওলানা কাসেম নানুতুবী এবং মাওলানার রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ এর কার্যক্রম এই লক্ষেই হয়েছিল। উত্তর কাবায়েলি এলাকায় মোল্লা সাহেব আখন্দ ও হাজী সাহেব তারংজয়ী রহঃ এর জিহাদ, ওয়াজিরিস্তানের মোল্লা পাওয়েন্দা এবং হাজী মির্জা আলী খান এর জিহাদ ও এই উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য ছিল। হিন্দুস্তানকে ইংরেজদের থেকে স্বাধীন করার জন্য তাহারিকে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ও মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহঃ এর ইংরেজদের 'বন্ধুত্ব ত্যাগের আন্দোলন' এই উদ্দেশ্যেই ছিল।

হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলী থানবী ও আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী (রহিমাহুমাল্লাহ) এর পাকিস্তান আন্দোলন এবং মাদানী রাহিমাহুল্লাহ এর ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্তানের মতামত— এইসবই হিন্দকে কাফিরদের থেকে মুক্ত করা ও এটাকে দারুল ইসলাম বানানোর জন্য ছিল।

শাহ আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ শুধু ফাতওয়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং দারুল হারবকে আবার দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য কার্যক্রম শুরু করেন। শাহ সাহেব এর নিকট দারুল হারবকে দারুল ইসলামে পরিবর্তন করার একমাত্র পদ্ধতি ছিল নিজ ঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য হিজরত করা এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। সাইয়িদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদের নেতৃত্বে জিহাদ ছিল এ ফাতওয়ার ই বাস্তবায়ন। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ফাতওয়ার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ের সমস্ত মুসলিম দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমস্ত ইসলামী জিহাদ ও জামাআতের পিছনে মৌলিক চিন্তা এটাই ছিল যে, হিন্দুস্তান দখলদারদের কব্জায় চলে গেছে; তাই এখন মুসলিমদের হুকুমাত আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ফলে এই ফতোয়া ছিল সমস্ত ইসলামী জিহাদ ও জামাআতের মূল ভিত্তি। স্যার সাইয়িদের থিওরি, কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠান; বরং হিন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎস ছিল এই ফাতওয়া-ই।

ইংরেজরা তাদের ষড়যন্ত্র সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দুস্তান দখল করে হিন্দুস্তানের সৈন্যদের মাধ্যমে তারা নিজেদের সামরিক ক্ষমতা অনেক মাত্রায় করে নেয়। এরপরে সামরিক ক্ষমতার জোরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত গুলোতে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। অপরদিকে হিন্দুস্তানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ প্রমুখে উলামায়ে হক্কের প্রচেষ্টায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী কার্যক্রম জোরদার হতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ দিয়ে– কুফফার শক্তি ছিল কয়েকভাগে বিভক্ত। হিন্দুস্তান দখল করেছিল ব্রিটেন। অপরদিকে রাশিয়া এবং ফ্রান্স ও মুসলিম ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিল। ১৮৩৯ সালে ব্রিটেন হিন্দুস্তানের পর আফগান

দখল করার পরিকল্পনা করে এবং এর জের ধরে প্রথম আফগান যুদ্ধ হয়; যেখানে প্রথমে ইংরেজরা আফগান দখল করলেও মুজাহিদীন কঠিন প্রতিরোধের ফলে ১৮৪২ সালে আফগান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্র আল-জাজায়িরের উপর হামলা করে বসে; যা সেসময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ফ্রান্সের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সেখানে মুসলিম মুজাহিদরা জিহাদ শুরু করে যাদের নেতা ছিলেন আমির আব্দুল কাদির। এ জিহাদের ফলে আমির আব্দুল কাদির আল-জাজায়িরের অর্ধেকের বেশি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করে সারিয়া বাস্তবায়ন শুরু করেন। সে সময় ফ্রান্স চুক্তি করে ইমারাহ কে মেনে নিলেও দুই বছরের মাথায় চুক্তি ভঙ্গ করে পুনরায় হামলা করে এবং আমির আব্দুল কাদির কে গ্রেফতার করে সিরিয়াতে দেশান্তর করা হয়।

১৮২৬ সালের দিকে ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বাদশাহদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। অপরদিকে হিন্দুস্তানের উপর ব্রিটেন এবং আল-জাজায়িরের উপর ফ্রান্সের দখল পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। রাশিয়া কান্দাহার,বলকান ও কৃষ্ণ সাগর দখলের জন্য বাহিনী তৈরি করছিল। এ অবস্থায় উসমানী খিলাফাতের পতনের ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব উসমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অনেক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জন্ম নিতে থাকে। যারা নিজ নিজ দেশীয় অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে।

এটাও একটি বাস্তবতা যে, যখন কোন রাষ্ট্রের পতন শুরু হয় তখন তারা অপর রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। এবং তাদের নীতিমালা গ্রহণ করা শুরু করে। এই অবস্থা উসমানীদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। পতনের সেই সময় উসমানীরা পশ্চিমা শাসন ব্যবস্থা ও তাদের শিল্প উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া শুরু করে। তারা চিন্তা করছিল পশ্চিমাদের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হয়তো তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু না কখনো এমনটা হয়েছে আর না কখনো এমনটা হবে।

১৮৩৯ সালে সুলতান মাহমুদ প্রশাসনকে নতুনভাবে গঠনের নামে উসমানীদের মধ্যে পরিবর্তন শুরু করে। এর মধ্যে ছিল সামাজিক, বাণিজ্যিক, সামরিক ও আইনগত পরিবর্তন। এ উন্নতির সহজ অর্থ ছিল এটাই যে, এখন উসমানী সাম্রাজ্যকে পূর্ণভাবে পশ্চিমা ধাঁচে সাজানো শুরু হয়। এই গঠনের সারসংক্ষেপ হলো–

- ১৮৩৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকার চার্টার গ্রহণ করে নেওয়া হয়।
- ১৮৪০ সালে পশ্চিমাদের অনুকরণে প্রথমবার ওসমানী সাম্রাজ্যে কাগুজে নোট জারি হয়।
- ১৮৪৩-১৮৪৪ সালের মধ্যে বাহিনীকে পূর্ণভাবে পশ্চিমা যুদ্ধনীতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী গঠন করা হয়। এ বাহিনীর গঠনের মূল ভূমিকা রেখেছিল পশ্চিমা ধর্মহীন যুদ্ধের থিওরির জনক জেনারেল ক্লজউইজ এর শাগরিদ জেনারেল মোল্টকি।
- ১৮৪৭ সালে উসমানিদের জন্য জাতীয়তাবাদী সংগীত ও পতাকা বানানো হয়।
- সে বছর ওসমানী দের মধ্যে পশ্চিমা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু করা হয়।
- শার'ইয়ার বিধানকে কাট ছাট করে কিছু পশ্চিমা ফৌজদারি নীতি গ্রহণ করা হয়।
- ১৮৪৮ সালের পশ্চিমা ধাঁচে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ১৮৫৬ সালে কাফিরদের জন্য জিজিয়া বিলুপ্ত করে পশ্চিমা ধাঁচে ট্যাক্সব্যবস্থা চালু হয়।
- অমুসলিমদেরকে বাহিনীতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।
- ১৮৬৯ সালে পশ্চিমাদের মতো নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

এই সংশোধন ও এই নতুন গঠন উসমানীদের পতনের গতি আরো বৃদ্ধি করে।

হিন্দুস্তানে ইংরেজদের চক্রান্ত চলমান ছিল। মুজাহিদীনরাও তাদের মত প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। সে সময় মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে তা-ই ছিল যা আজকের মুজাহিদদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদের পরাজিত করে আল্লাহতালার শার'ইয়া বাস্তবায়ন করা। এর কর্মপদ্ধতিও তা-ই ছিল, যা আজ মুজাহিদরা বাস্তবায়ন করছে।

১৮৫৭ সালে মিরাট অঞ্চল থেকে হিন্দুস্তানি বাহিনীর 'বাঙ্গালি ফৌজ' বিদ্রোহ করে ও এর মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। এর ফলে দিল্লি মুসলিমদের দখলে চলে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিদ্রোহী সেনাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য নেতা ছিল না। এর ফলে ইংরেজদের অনুগত হিন্দুস্তানি বাহিনী; যাদের অধিকাংশ ছিল মুসলিম তাদের মাধ্যমে ইংরেজরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করে এবং এই আন্দোলন তখনকার মতো ব্যর্থ হয়। এই আন্দোলনের পর হিন্দুস্তান সরাসরি ব্রিটেন রাজ্যের অধীনে চলে যায়।

১৮৫৩ সালের রাশিয়া ও উসমানীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের কারণ ছিল, রাশিয়া খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থান বায়তুল মুকাদ্দাস এর জিম্মাদারি নিতে চাচ্ছিল যা উসমানীরা ক্রুসেড চলাকালীন এক চুক্তির ভিত্তিতে ফ্রান্সকে দিয়ে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স উসমানীদের সাথে অংশ নেয়। কিন্তু স্বার্থ হাসিল হয়ে যাওয়ার পর ফ্রান্স ও ব্রিটেন আবার উসমানীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। এক্ষেত্রে তারা উসমানী অঞ্চলে থাকা খ্রিস্টানদের সাহায্যে শাম, লেবানন ও বুলগেরিয়াতে বিশৃঙ্খলা ঘটায় এবং তাদেরকে রক্ষার নামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। অপরদিকে তুর্কি যুবকদের একটি দল ইয়ং তুর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়; যার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সমতার স্লোগান প্রচার করতে থাকে। 'ইয়ং তুর্ক' ছিল মূলত উসমানী সালাতানাতকে পশ্চিমে ধাঁচে সজ্জিত করার একটি কুফল। তাদের দাবি ছিল রাষ্ট্রের জন্য মানব রচিত আইন বানাতে হবে এবং পার্লামেন্ট বানিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। সুলতান আব্দুল হামিদ দ্বিতীয় রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম পার্লামেন্ট তৈরীর অনুমতি দেন। পরবর্তীতে দু'বার তিনি এ পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দেন। যার ফলে রাষ্ট্রের

অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রের কয়েকটি অংশ বিদ্রোহ শুরু হয়। এ বিদ্রোহের ধারা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে। এরপর ১৯০৮ সালে জনগণের চাপে সুলতান আব্দুল হামিদ আবারও পার্লামেন্ট চালু করেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি ১৯০৯ সালে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তাকে হটিয়ে তার ভাই মোহাম্মদ পঞ্চম সিংহাসন দখল করে। আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে তুর্কি যুবকদের এই বিদ্রোহে তিনজন পাশা সাহায্য করেছিল। এই তিনপাশার উপরে অভিযোগ ছিল যে তারা উসমানীদেরকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করেছিল।

১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফার্নিনান্ড সার্বিয়া সফরে থাকাকালীন সময় আত-তায়ের হাতে নিহত হয়। অস্ট্রিয়া তার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে হস্তান্তরের দাবি জানায়। অপরদিকে সার্বিয়া ব্রিটেনের সাহায্য আবেদন করে। কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট একটি বিষয়ে একটি বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়। ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স একজোট হয়ে যায়। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও উসমানীরা তাদের বিরোধী জোটে পরিণত হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া– এই তিন শক্তি মিলে উসমানী সাম্রাজ্যকে ভিতর ও বাহির থেকে দুর্বল করে ফেলেছিল। তাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্য এটি ছিল এক সোনালি মুহূর্ত,যেখানে তারা উসমানিদের খতম করে উম্মাতে মুসলিমার সমস্ত সম্পদ দখল করে নিতে পারবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স খিলাফাতের রাজধানী তুর্কিতে সরাসরি হামলা করার ফয়সালা করে। কিন্তু মূল প্রশ্ন ছিল, ব্রিটেনের কাছে কি এত সামরিক শক্তি আছে, যার দ্বারা তারা যুদ্ধ লড়তে পারবে? উত্তর হলো, ‘হ্যাঁ, ছিল।’ বৃটেনের কাছে ১৫ লক্ষ হিন্দুস্তানি সেনা ছিল, যার অর্ধেকের বেশি ছিল মুসলিম। তারা হিন্দু ও শিখ দের সাথে মিলে নিজেদের ভাই ও খিলাফাতকে খতম করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।

এই সেনাদের ব্যবহার করে কুফফার জোট মিশর, ইরাক, ফিলিস্তিন সহ খিলাফাতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে যুদ্ধ করতে থাকে।

এ সময় একদিকে ফ্রান্স,রাশিয়া ও ব্রিটেন মিলে উসমানীদের পতনের চক্রান্ত করছিল। তখন অপরদিকে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহিমাহুল্লাহ হিন্দুস্তানে ইংরেজ বাহিনীর উপর কঠিন হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি জানতেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের শক্তির উৎস হিন্দুস্তান। তাই তার পরিকল্পনা ছিল আফগান শাসক ও কাবায়েলি জনগণকে সাথে নিয়ে জিহাদ করে হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদের হুকুমত খতম করে দিবেন। যদি হিন্দুস্তানে ব্রিটেন পরাজিত হয় তাহলে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীদের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। এই পরিকল্পনা সফলতা লাভের জন্য আবশ্যক ছিল প্রথমত উসমানিদের কাছ থেকে ফতোয়া বা অনুমতিনামা এনে আফগান আমিরকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা। দ্বিতীয়ত, কাবায়েলি উলামা ও মুজাহিদদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা। তৃতীয়ত, হিন্দুস্তানের বাহিনীতে থাকা মুসলিম সেনাদেরকে এই কথা জানানো যে ইংরেজদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফুরি। এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি সরাসরি কাফির ও জাহান্নামী।

আফগানের তৎকালীন আমির হাবিবুল্লাহ এবং সিরাজের শাসক শরিফ হোসাইন এর গাদ্দারির ফলে এই আন্দোলনের অগ্রপথিক শাইখুল হিন্দ ও মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রাহিমাহুমাল্লাহ) ইংরেজদের হাতে গ্রেফতার হন এবং এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কার্যক্রম হিন্দুস্তান ও আফগানের জিহাদী আন্দোলনে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ বাহিনী কয়েক দফায় ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা করে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস; যা মুসলিমদের প্রথম কিবলা ও সুলতান সালাহুদ্দিন এর সময় থেকে তখন পর্যন্ত ৭৪০ বছর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা দখল করা তুর্কি মুজাহিদ বাহিনীও তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকে। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয় এবং ওসমানীদের ৪০০ বছরের ক্ষমতা শেষ হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের হাতে চলে যায়। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, এ সময় ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল মুসলিম; যারা হিন্দুস্তানের সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খিলাফতের পতনের পিছনে আরেকটি বড় কারণ ছিল মুসলিম উম্মাহর কতিপয় গাদ্দার শাসক। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল হিজাজের সর্দার শরীফ হুসাইন। শরিফ হোসাইন ই ছিল আরব জাতীয়তাবাদের আহ্বায়ক। বৃটেনের গোপন এজেন্সি তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং এই শর্তে ব্রিটেনের সাথে অংশ নিতে প্রস্তুত হয় যে যুদ্ধের পর ব্রিটেন আরবদের জন্য আলাদা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবে। ব্রিটেন শুধুই উসমানীদের পতনের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল এবং মধ্যপ্রাচ্য নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিল। তখন কিছু সময়ের জন্য আরব কবিলাগুলোর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাই আরব কবিলাগুলোকে এই মিথ্যা আশ্বাসে উসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। যেহেতু তাদের কাছে কোন সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব ছিল না তাই ব্রিটিশ জেনারেল এডওয়ার্ড লরেন্স কে এই কাজের দায়িত্ব দেয়। লরেন্স এসে আরবের সামরিক বিদ্রোহকে সংঘটিত করে। অপরদিকে শরিফুল হোসেনের ছেলে ফয়সাল নেতৃত্বের ঘাটতি পূরণ করে। লরেন্স বিদ্রোহের জন্য অস্ত্র ও স্বর্ণ সাপ্লাই দেয়। লরেন্স ও শরিফ হোসাইন গোপনে সাক্ষাৎ করছিল এবং এ দু'জন মিলে আরব বিশ্বে উসমানীদের ক্ষমতা নিঃশ্বাসের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। ১৯১৭-১৯১৮ সাল পর্যন্ত আরব বিদ্রোহ উসমানীদেরকে তাদের ত্রিশ হাজার সেনাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে এনে এই বিদ্রোহ দমানোর কাজে ব্যবহার করতে বাধ্য করে। আর এটাই ছিল বিদ্রোহ থেকে প্রাপ্ত ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় সফলতা।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা জোট বিজয়ী হয়। বিশ্বযুদ্ধ বন্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ই আগস্ট উসমানী এবং জোট বাহিনীর মধ্যে ফ্রান্সের সেভ্রে অঞ্চলে এক চুক্তি হয়, যাকে সেভ্রে চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তি মূলত মুসলিম উম্মাহর মানচিত্রকে খন্ড-বিখন্ড করা চুক্তি ছিল। সুলতান মাহমুদের অবস্থা তখন জোট বাহিনীর হাতে কয়েদির মত ছিল। মিত্রবাহিনী তাকে যা-ই আদেশ করত সে তার উপরেই দস্তগত করতো। এই চুক্তির অধীনে ইরাক, হিজাজ, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জরদান ব্রিটেনকে দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে শাম, আনাতুলিয়ার দক্ষিণ-

পূর্ব অংশ ফ্রান্সকে দেওয়া হয় এবং বাকি অংশ গ্রিসকে দেওয়া হয়। এই চুক্তি মূলত ছিল ১৯১৬ সালে হওয়া ফ্রান্স-ব্রিটেনের মধ্যে ইসলামী বিশ্বকে বন্টন করার আরেক চুক্তির বাস্তবায়ন।

শক্তি সম্পাদক ও যুদ্ধের বন্দের পর কুফফার রা ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিতে থাকে। এ সময়টাতে উসমানীদের কেন্দ্র তুর্কির উপর পুরো দুনিয়ার শক্তিগুলো দখল প্রতিষ্ঠা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আইনহীন ভাবে দেশ চলছিল। ইস্তাম্বুলে থাকা সুলতানের অবস্থা জোট বাহিনীর হাতে কয়েদির মত ছিল। পুরো তুর্কিতে কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। এটা এমন এক শূন্যতা ছিল, যা কামাল আতাতুর্ক পূরণ করেছিল। সে সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা শ্লোগানে একত্রিত করে। কামালের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল আরব বিশ্ব থেকে বিমুখ হয়ে শুধু তুর্কিকে পশ্চিমা শক্তির হাত থেকে স্বাধীন করে নেওয়া। সে একই সাথে সুলতান ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ছিল। তুর্কি জাতি,যারা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুস্তাফা কামালের স্লোগানে তারা নতুন জীবন ফিরে পায়। ১৯১৯ সালের রাষ্ট্রীয় নির্বাচনের কামালের সাথীরা অর্জন করে নেয়। এ বিজয়ের ফলে তারা আঙ্কারাতে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে পশ্চিমাদের থেকে স্বাধীন এক গণতান্ত্রিক তুর্কি রাষ্ট্র দাবি জানাতে থাকে। এবং সেভ্রে চুক্তিকে মেনে নেওয়া কে অস্বীকার করতে থাকে। এখন তুর্কির যুদ্ধে মূল লক্ষ্য হয়ে যায় সমস্ত মুসলিম এলাকা থেকে মুখ ফিরিয়ে তোর কি জাতীয়তা সংরক্ষণ এবং এ জাতীয়তার অধীনে তৈরিতে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা। ফলে এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে গিয়েছিল, যাদের নেতা ছিল কামাল আতাতুর্ক। এই জাতীয়তাবাদি জজবা ছিল খিলাফাতের মৃত্যু। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কয়েক দফা যুদ্ধের পর কামাল কামালের বাহিনী ইস্তাম্বুল দখল করে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম উম্মাহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়। মুসলিমদেরকে স্বাধীনতা,সমতা, উন্নতি ও দেশপ্রেমের ধর্মহীন স্লোগান শেখানো হয়। এখন তারা এসব স্লোগানের ভিত্তিতে

নিজেদের ভবিষ্যৎ বর্ণনা শুরু করে দেয়। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ শরিফ হুসাইন ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ ও ফয়সালের মত গাদ্দার ও পেয়ে যায়, যারা ফিলিস্তিন ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিক্রি করে ইহুদীদের হাওয়ালা করে দিয়েছে। আরবের বাদশা হওয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং আরব জাতির উন্নতির দাবিদাররা এখন আরবকে হিজাজ ইরাক ও জর্ডানে ভাগ করে নেয়।

তুর্কিতে কামাল আতাতুর্ক পুরো জাতিকে স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র ও উন্নতির শ্লোগান শিখিয়ে দিন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তুর্কিতে আরবি শব্দের ব্যবহার বিলুপ্ত করে ইংরেজি শব্দ চালু করা হয়। ইংরেজের পোশাক গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং সেটাকে তুর্কিদের জাতীয় পোশাক ঘোষণা করা হয়। সময়ের সাথে সাথে তুর্কিতে কামালের প্রভাবে ধর্মহীন সংবিধান বাস্তবায়িত হতে শুরু করে যা আজও চলমান রয়েছে।

উসমানি খিলাফাতের পতনের পর মুসলিম উম্মার ওপর নেমে আসে পরাজয় ও গোলামীর এক অন্ধকার যুগ। অভিভাবকহীন মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্য সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের নির্মম শিকারে পরিণত হয়। জাতিসংঘ' কে কেন্দ্র করে বিশ্ব কুফফার জোট একটি সর্বগ্রাসী কুফরি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলে। মুসলিম দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয় তাদের ওয়াফাদার পুতুল সরকার। যারা মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে কাফিদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। পাশ্চাত্য তার সকল কুফরি আক্বিদা ও মূল্যবোধ তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। তাদের পোষা শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে তারা মুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও এসব কুফরি আক্বিদা ও মূল্যবোধের আলোকে সাজায়। মিডিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের শিরকি আকিদা ও কুফরি মূল্যবোধগুলোকে মুসলিমদের অন্তরে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্যের এই আক্বিদা গুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সেক্যুলারিজম,লিবারেলিজম, জাতীয়তাবাদ,লিঙ্গ-সমতা, নারী স্বাধীনতা, বস্তুবাদ, নারীবাদ ইত্যাদি।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে ওফাত হন, তখন নিজের পরে খিলাফাতে রাশিদাকে রেখে যান। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বড় বড় শক্তিশালী সুলতানগণ অতিবাহিত হয়েছেন। যাদের মধ্যে গজনবি, সেলজুকি, আইয়ুবী,জিংকি ও মামলুকরা অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রত্যেকেই আব্বাসি খিলাফাতকে প্রতিষ্ঠিত রাখাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করেছেন। তাতারদের হামলার পর যখন বাগদাদে আব্বাসি খিলাফাতের পতন হয় তখন সুলতান বাইবার্স হালাকু খানকে আইনে জালুতে পরাজিত করার পর খিলাফাতকে প্রতিষ্ঠা করে নিজের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে নেন এবং দ্বিতীয়বার আব্বাসি খিলাফাতকে প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমদের কেন্দ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে মুসলিমদের আসল শাসন ব্যবস্থা হল খিলাফাত।

খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা তখন যতটা ছিল এখনও ঠিক ততটাই আছে। কিন্তু কুফফারদের ষড়যন্ত্রের ফলে এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার মানসিকতা অধিকাংশ মুসলিমেরই হারিয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও খিলাফাত পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে কুফফারা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদেরকে অপরাজেয় শক্তি হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করার। তাদের প্রোপাগান্ডায় প্ররোচিত হয়ে অধিকাংশ মুসলিমও নিজেদের সোনালী ইতিহাস কে ভুলে তাদের কুফরি সভ্যতার পূজা শুরু করে দিয়েছে।

১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর পুরো দুনিয়ায় আমেরিকা ও পশ্চিমাদের বৈশ্বিক হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সে সময় তাদের ধারণামতে এমন কোন শক্তি ছিল না যারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম। কিন্তু তারা সে সময় ধাক্কা খায়, যখন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে তাদের তাবেদার শাসক থাকা সত্ত্বেও মুসলিম যুবকরা মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা আমেরিকা ও পশ্চিমা ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোটের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে। তারা পুরো বিশ্বে এই জোটকে নিশানা বানানো শুরু করে এবং আমেরিকা ও পশ্চিমাদের বৈশ্বিক অবস্থাকে গ্রহণ করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এর ফলে ক্রুসেড ও জায়োনিস্ট ইহুদিরা এক নতুন যুদ্ধে প্রবেশ করে এবং তাদের বৈশ্বিক হুকুমত এক নতুন বিপদে প্রকম্পিত হতে থাকে। যে উম্মাহ ক্রুসেড-ইয়াহুদি জোটের হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের পর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গোলাম হয়ে গিয়েছিল, সেই উম্মাহর যুবকরা এক শতাব্দীর কম সময়ের ভেতর ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তার মোকাবিলায় ময়দানে বের হয়ে এসেছে। এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল, একদিকে বিশ্বের সমস্ত আন্তর্জাতিক শক্তি ও অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর সেই সমস্ত যুবক, যাদেরকে নিজ রাষ্ট্রও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমারা তাদের ব্যাপারে শুধু এই কারণে ভীত ছিল যে, এই যুবকরা তাদের বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।

মুজাহিদ বাহিনী পৃথকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের গাদ্দার জালিম শাসক ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে। এর মধ্যে আফগান জিহাদী আন্দোলন পুরো বিশ্বের মুসলিমদের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এই জিহাদে অংশ নেওয়ার জন্য আরব ও অনারব হাজারো যুবক আফগানে হিজরত করে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। মুজাদ্দিদে জিহাদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের চেষ্টা ছিল আরব বিশ্বে জিহাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। যার ফলে মুসলিম যুবকদের মধ্যে উসমানি খিলাফাত পতনের পৌনে শতাব্দীর ভেতরে খিলাফাত ফিরে আনার চেতনা সৃষ্টি হয়। তিনি তখন আফগানের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত মুজাহিদদের আন্দালুস বিজয় করা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার ফতোয়া দেন। এবং তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেন যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাদের অধীনতা থেকে স্বাধীন না হবে ততদিন পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে।

এই সেই চিন্তাগত নির্দেশনা ছিল, যা মুজাহিদদেরকে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সামনে এনে দাঁড় করায়। সেই সময় আফগান যুদ্ধ ক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। সেখানে হাজারো যুবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং রাশিয়া চলে যাওয়ার পর তারা এ প্রশিক্ষণ সহ নিজ নিজ রাষ্ট্রে ফিরে যায় সেই সাথে এই জিহাদ আফগান, মিশরও জর্দানসহ ৬০-৭০ টি অঞ্চলের জিহাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদ ও

আলিমদের একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও ফায়দা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।

এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলিম উম্মাহ পায় উসামা বিন লাদিনের মতো মুজাহিদ নেতা, যিনি প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কাইদাতুল জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আফগান থেকে রাশিয়া চলে যাওয়ার পর যখন মুজাহিদরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই শুরু করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কিছু নির্বাচিত বান্দাকে দাড় করিয়ে দেন, যারা সম্মান বা ক্ষমতার প্রত্যাশী ছিল না। যাদের জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯১ সালে আমিরুল মোমেনিন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর এর নেতৃত্বে তালিবান আন্দোলন শুরু হয় এবং পাঁচ বছরের ভেতর আফগানের অধিকাংশ এলাকা তাদের শার'ই ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে এবং সেখানে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খিলাফাত পতনের পর এটাই ছিল প্রথম ঘটনা, যেখানে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মোকাবিলায় মুসলিমরা নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা ২০০১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ক্রুসেডার ও ইহুদি জোটকে মুসলিমদের ইমারাত কঠিন ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে ফেলে দেয়, যা তাদের বৈশ্বিক বিজয় ও নিউ ওয়ার্ল্ড ওর্ডারে কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ছিল।এজন্য তারা এর বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা শুরু করে।

যখন আমেরিকা ইমারাতের উপর হামলার জন্য পরিকল্পনা করছিল এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল তখন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আরব মুজাহিদরা অগ্রগামী হয়ে আমেরিকার উপর ঐতিহাসিক আক্রমণ করে বসে. তারা নতুন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে আমেরিকাকে তার ভূমিতেই আক্রমণ করে এবং তাদের অর্থনীতি ও সামরিক কেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনকে লক্ষ্য বানায়। এই হামলা ক্রুসেড-জায়োনিস্ট জোট এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে চলমান যুদ্ধে আরও অধিক উত্তপ্ততা সৃষ্টি করে। পশ্চিমারা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত করে দেয়। আধুনিক ইতিহাসে এই

হামলাকে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটাই সেই মোড়, যেখান থেকে ক্রুসেড ও জায়োনিস্ট জোটের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন শুরু হয়।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের উত্থানের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি এটা মূলত মুসলিমদের উপর একটা বড় ট্রাজেডি, যা মুসলিমদের শক্তি খিলাফাতকে ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এখন মুসলিমদের উপর আবশ্যক ছিল সম্মিলিতভাবে এই ট্রাজেডি থেকে উত্তরণের পথ অবলম্বন করা। কিন্তু পশ্চিমাদের মানসিক আগ্রাসনের শিকার বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম নিজেরা তো এই অভিশপ্ত ব্যবস্থার গোলামী করছেই, অপরদিকে পশ্চিমাদের সাথে তাল মিলিয়ে আল্লাহর যে জানবাজ সৈনিকেরা তাদের পক্ষ থেকে জিহাদ ও খিলাফাত ফিরিয়ে আনার ফরজিয়াত আদায় করছে তাদেরকে পথভ্রষ্ট, খারিজি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করছে।

তবে ষরযন্ত্র করে সত্যকে মিটিয়ে দেয়া যায় না, সত্যান্যাসীরা ঠিকই তা খুঁজে নেয়। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইতিহাস সমস্বরে চিৎকার করে এটাই বলছে যে জিহাদ করা ও এর মাধ্যমে খিলাফাত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বর্তমান যামানার মুসলিমদের মুক্তির ও মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে থাকা সকল ফিতনা নির্মূলের একমাত্র উপায়। আর আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃত অনুসারী তারাই যারা বাতিল ও অধর্মের সাথে আপোষ না করে তাকে মিটিয়ে দেয়ার প্রয়াসে নিজেদের জান-মাল কুরবান করছে।

তাত্ত্বিক আলোচনা

জিহাদের পরিচয়

জিহাদের আভিধানিক অর্থ : 'জিহাদ' শব্দটি আরবী 'জাহাদা' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া'। আরবদের কাছে শাব্দিকভাবে 'জিহাদ'-এর অর্থ হলো 'কোনো কাজ বা মত প্রকাশ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বা কঠোর সাধনা করা'। 'কঠোর সাধনা করা', 'কষ্ট বহন করা', 'শক্তি ব্যয় করা' 'সংগ্রাম করা' আভিধানিক অর্থে জিহাদ এসব ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

শাব্দিক অর্থ মোতাবেক, এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সশস্ত্র কিংবা নিরস্ত্র উভয়ই হতে পারে; অর্থ ব্যয় করেও হতে পারে, ব্যয় না করেও হতে পারে।

' জিহাদ' শব্দের এই শাব্দিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিমদের জিহাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে নিজের প্রবৃত্তি, শায়ত্বন, দখলদার কিংবা কাফির শক্তি। পাশাপাশি, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিহাদ হতে পারে আল্লাহর পথেও (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ)। তাই এই জিহাদ হতে পারে আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আবার হতে পারে শায়ত্বনকে খুশি করার জন্যও। যেমন : কাফিরদের জিহাদ হলো শায়ত্বনকে খুশি করার জন্য। কাফির পিতারা তাদের মু'মিন সন্তানদের সত্য বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করানোর জন্য যেসব কাজ করতো, সেগুলোকে কুরআনে জিহাদ বলা হয়েছে :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

' তোমার পিতামাতা যদি জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরীক কর যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদেরকে অমান্য কর।" (সূরা লুকমান ৩১ : ১৫)

পারিভাষিক অর্থ: হানাফী মাযহাবের আইন গ্রন্থ 'বাদাউস্ সানায়ী'-হতে জানা যায়, জিহাদের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা। শার'ঈ অর্থে জিহাদ হলো নফস, অর্থ ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও শক্তি খাটানো।

‘আদ-দুররুল মুখতার’ এ জিহাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله

“শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করা এবং যে উক্ত আহ্বানে সাড়া দিবে না, তার বিরুদ্ধে কিতাল করা।”

শাফি’ঈ মাযহাবের আইনগ্রন্থ ‘আল ইকনা’-তে বলা হয়েছে, ‘জিহাদ হলো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।’ আল-শিরাজী তাঁর ‘আল মুহাজাব’-এ বলেন, ‘জিহাদ হলো ক্বিতাল (যুদ্ধ)’।

সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবন হাজার (রহঃ) ‘ফাতহুল বারী’-তে বলেন, জিহাদ এর শার্’ঈ অর্থ হলো: وَشَرْعًا بَذْل الْجَهْد فِي قِتَال الْكُفَّار অর্থাৎ- ’’কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা-সংগ্রাম করা’’।

মালিকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ ’মানহুল জালীল’-এ জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -

قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ

’ আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চে করার জন্য কাফিরদের (যাদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি নেই) সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই .....।’

হাম্বালী মাযহাবের আইনগ্রন্থ ’আল মুগনী’-তে ইবনু কুদামাহ্ও ভিন্ন কোনো সংজ্ঞা দেননি। ’কিতাবুল জিহাদ’ অধ্যায়ে তিনি বলেন, যা কিছুই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা ফরযই ’আইন বা ফরযই কিফায়াহ্ যা-ই হোক না কেন, অথবা এটা মু’মিনদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করা হোক বা সীমান্ত রক্ষা হোক- সবকিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, ’ শত্রুরা এলে সীমান্তরক্ষীদের ওপর জিহাদ করা ফরযই ’আইন হয়ে যায়। যদি শত্রুদের আগমন স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমীরের নির্দেশ ছাড়া সীমান্তরক্ষীরা তাদেরকে মোকাবেলা না করে আসতে পারবে না। কারণ একমাত্র আমীরই যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।’

এছাড়া সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতসহ সকল হাদীস গ্রন্থে 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বিষয়ক হাদীসই স্থান পেয়েছে।

জিহাদের সংজ্ঞায় ইমামুল মুজাহিদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ 'কিতাবুল জিহাদ' গ্রন্থে বলেন–

'জিহাদ শব্দটির একটি সাধারণ ও একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। জিহাদের সাধারণ অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শার'ইয়াতের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাককাত সহ্য করা হয় তা-ই জিহাদ। তা যে কোন পথে বা যে কোন পন্থায় ই হোক না কেন।

কিন্তু 'জিহাদ' যা শার'ইয়াতের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করা, মুসলমানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও কাফির-মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।'

মক্কায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না, তাই মাক্কী সূরাহ্সমূহে 'জিহাদ' শব্দটি শার'ঈ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين

' আর যে ব্যক্তি সাধনা (জিহাদ) করে, সে তো নিজেরই জন্য সাধনা করে। আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।'' (সূরা আল 'আনকাবূত ২৯ : ৬)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

' আমি মানুষকে স্বীয় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি তোমার ওপর চাপ (জিহাদ) দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।'' (সূরা আল 'আনকাবুত ২৯ : ৮)

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

’ অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) চালিয়ে যান।’’ (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ৫২)

মদীনায় অবতীর্ণ ২৬টি আয়াতে জিহাদের বিষয়টি এসেছে এবং এগুলোর অধিকাংশই সুস্পষ্টভাবে ’যুদ্ধ’ (ক্বিতাল) অর্থ বহন করে। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

’ সমান নয় সেসব মু’মিন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ওই সব মু’মিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়া’দা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর।’’

(সূরা আন্ নিসা ৪ : ৯৫)

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ মানে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং ঘরে থাকার চেয়ে সেটা উত্তম।

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

’ তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়; এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে এবং নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।’’(সূরা আত তওবা ৯ : ৪১)

ঐতিহাসিক তাবূক যুদ্ধের সময় প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়। তাবূক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল খেজুর কাটার মৌসুমে। তখন গরমও ছিল খুব বেশি। তাই কেউ কেউ ক্ষেত-খামার, ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাতে, কেউ পারিবারিক কাজের অজুহাতে, কেউ বা অসুস্থতার বাহানা তুলে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আল্লাহ তখন এই আয়াত নাযিল করে তাদের প্রার্থনা বাতিল করে দিলেন এবং ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক, খুশি-

অখুশি, সশস্ত্র-নিরস্ত্র, ধনী-গরিব সবার জন্য যে কোনো অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া ফরয করে দিলেন। এখানে 'জিহাদ' শব্দটি পরিষ্কারভাবে 'যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

একই অর্থ রয়েছে এই সূরার ৮৮ নম্বর আয়াতে, ' ' কিন্তু রসূল ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও নিজেদের জান দিয়ে, তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম।'' (সূরা আত-তওবা ৯ : ৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত শত হাদীসে 'জিহাদ'-কে শার'ঈ অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধ ও যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ সায়িম (রোযাদার), যে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছে, যে তার সওম ও সালাত আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না; (সে এরূপ সাওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে।(বুখারী হাঃ ২৭৮৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৭৭)

এ হাদীসে পরিষ্কারভাবেই 'মুজাহিদ' বলতে যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে- যে যোদ্ধা 'যতক্ষণ না ফিরে আসে' ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবসমূহ পেতেই থাকে।

এর অন্য হাদীসে 'আবদুল্লাহ বিন হুবশী বলেন,

قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِه وَنَفْسِه قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهْرِيقَ دَمُه وَعُقِرَ جَوَادُه

লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো জিহাদ উত্তম?'

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম?

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন, ওই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পাও কেটে ফেলা হয়। (আবূ দাঊদ, হাঃ ১৪৫১)

আরেক হাদীসে ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَه أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ

যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হলো, আল্লাহ তাদের রূহগুলোকে সবুজ পাখির পেটের ভিতরে ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযক আহরণ করেন, অতঃপর তাঁরা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর 'আরশের নিচে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তাঁরা নিজেদের আনন্দ ও শান্তিময় জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, ' আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।' এরই প্রেক্ষিতে সূরা আ-লি 'ইমরান-এ নাযিল হয়:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"আর যারা আল্লার পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত"- (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৬৯)। (আবূ দাঊদ, হাঃ ২৫২২)

প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদে মৃত্যুবরণ করা খোদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই একান্ত বাসনা ছিল :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ,

যদি কিছু মু'মিন এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সবাইকে আমি সওয়ারী দিতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও দূরে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর আবার জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই। (বুখারী:২৭৯৭, মুসলিম: ৪৯৬৭)

জিহাদের সারকথা

জিহাদ ইসলামের অন্যতম একটি ফরয ইবাদাত। বলা হয়ে থাকে ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি, যথা– ইমান, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ। আর জিহাদ হচ্ছে ইসলামের ছাদ। একটি শক্তিশালী মজবুত ঘর বা ইমারাতের জন্য ভিত্তি যেমন আবশ্যক তেমনই ছাদ ছাড়াও তা পূর্ণতা পায় না। ছাদ না থাকলে ভিত্তি যতই মজবুত হোক না কেন বাহিরের আক্রমণ ও বিরূপ আবহাওয়া থেকে তা অনেক বেশি অনিরাপদ হয়ে পড়বে। ইসলামে জিহাদের হাকিকাত বা বাস্তবতা ও ঠিক এরকম। জিহাদের মাধ্যমে যদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সমাজের কর্তৃত্ব স্থানে রাখা না হয় তাহলে শত্রুরা সহজেই মুসলমানদের আক্রমণ করে নিজেদের শিকারে পরিণত করে ফেলবে এবং তাদের ভিত্তি অর্থাৎ ইমান আমল ও নষ্ট করে ফেলবে। ঠিক এই বাস্তবতাই আমরা এ সময়

দেখতে পারছি। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে ইসলামিক খিলাফাত কে হারানোর পর থেকেই মুসলিম বিশ্বের চরম দুর্দিন শুরু হয়ে গেছে। এখন কুফফাররা মুসলিমদের উপর আধিপত্য কায়েম করে আমাদের বুনিয়াদ ইমানকে আমলকে নষ্ট করে আমাদেরকে নিজেদের দাসে পরিণত করেছে। তাই মুসলিম সভাজে ইসলামের ভিত্তিকে ঠিক রাখতে হলে জিহাদকে টিকিয়ে রাখার বিকল্প নেই।

জিহাদের হুকুম

জিহাদ কুরআনের একাধিক আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী একটি ফরয ইবাদাত। অন্যান্য ফরযের মতো এর ধরণ ও দুই প্রকার। তথা– ফরযে আ'ইন ও ফরযে কিফায়া।

ফরযে কিফায়া অর্থ এমন ফরয, যার দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানের। কিছু মুসলমান আদায় করলে, সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। প্রত্যেককে সেই দায়িত্ব আদায় করতে হয় না। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে, তাহলে সবার উপর এর দায় থেকে যায় এবং সবাই গুনাহগার হয়। আর যদি কিছু লোক আদায় করে, কিন্তু কাজটি আদায় হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ লোক আদায় না করে, তাহলেও বাকিদের উপর তার দায় থেকে যায় এবং তারা গুনাহগার হয়।

পক্ষান্তরে ফরযে আ'ইন অর্থ এমন ফরয, যা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ হয়। যার যার উপর ফরয হয়, তাদের সবাইকে তা আদায় করতে হয়। অন্যথায় তারা গুনাহগার হয়।

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ মুসলামনদের দ্বীন ঈমান, ইজ্জত আব্রু, ভূখণ্ড ও ধন সম্পদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যেই পরিমাণ লোকের প্রয়োজন, পুরো উম্মত থেকে সেই পরিমাণ লোক জিহাদি কার্যক্রমে যুক্ত থাকা ফরযে কিফায়া। এই পরিমাণ লোক উক্ত ফরয আদায় করলে উম্মাতের সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এই পরিমাণ লোক

যদি তা আদায় না করে এবং ফরযটি অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে যারা যারা তা আদায়ের চেষ্টা করবে না, তারা সবাই গুনাহগার হবে।

"ইমাম কুদুরি রহ. বলেছেন, (জিহাদ ফরজে কেফায়া। যখন একদল লোক তা আদায় করবে, বাকিদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে)।

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক দিয়ে যখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, বাকিদের থেকে তার দায় সরে যাবে। যেমন জানাযার সালাত এবং সালামের উত্তর। (যদি কেউই তা আদায় না করে, সকল মানুষই তা ত্যাগ করার কারণে গোনাহগার হবে)। কারণ ফরয সকলের উপরই। আর সবাই জিহাদে বেরিয়ে পড়লে যেহেতু ঘোড়া অস্ত্র ইত্যাদির মতো জিহাদের উপায় উপকরণ প্রস্তুতের পথও বন্ধ হয়ে যাবে, এজন্য ফরযে কিফায়া। (তবে যদি 'নাফিরে আম' হয়) তখন ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

কাজি ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসি রহ বলেন–

"যে বিষয়টির উপর ইজমা চলে আসছে তা হল, উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, তাহলে অন্যদের থেকে এর দায়-ভার সরে যাবে। তবে যদি শত্রু কোনো ইসলামী ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়, তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়।" [তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ: ১/২৮৯]

তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়

বিশেষ তিনটি অবস্থায় জিহাদ ফারযে আ'ইন হয়ে যায়।

ইমাম ইবনে কুদামা মাক্বদিসি বলেন–

يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع؛ أحدها، إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام ... الثاني، إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. اهـ -المغني12/423 :

“তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ১. যখন (মু’মিন-কাফের) উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পলায়ন করা হারাম এবং অটল থেকে জিহাদ করা ফরজে আইন। ২. কাফেররা কোনো এলাকায় আক্রমণ চালালে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের উপর তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন। ৩. ইমাম যদি কোনো সম্প্রদায়কে জিহাদে বের হতে আহ্বান করেন, তাহলে তাদের সকলের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন।” -আলমুগনী: ১২/৪২৩

বিষয়টি হানাফি মাযহাবসহ সকল মাযহাবেই স্বীকৃত। দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯১ ও ৭/৯৮, আলবিনায়া: ৭/৯৬, রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭

এ সংক্রাত কুরআন, হাদিস ও ফুকাহাগণের কিতাব থেকে কিছু দলিল ও উদ্ধৃতি পেশ করা হলো–

“হে ঈমানদারগণ, যখন কাফেরদের চড়াও হয়ে আসা অবস্থায় তোমরা তাদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন অথবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।” [আনফাল: ১৫-১৬]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ত্বাবারী বলেন–

“আমার মতে এই আয়াতের দু’টি ব্যাখ্যার মাঝে তুলনামূলক সঠিক ব্যাখ্যাটি হল- আয়াতের বিধান এখনও বহাল রয়েছে। আয়াতটি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও; তার বিধান সব মুসলিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য শত্রুর মুখোমুখি হলে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা হারাম করেছেন। অবশ্য যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে কিংবা দারুল ইসলামে অবস্থানকারী মুমিন দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটলে ভিন্ন কথা। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার

পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যে দু'টি অবস্থায় পিছু হটা বৈধ করেছেন, তা ব্যতীত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, সে আল্লাহ তায়ালার ধমকের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা।" –জামিউল বায়ান ফি তা'বিলিল কুরআন ১৩/৪৪০

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন–

"যখন আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ক্বিতাল ফরজ করেছেন, তখন তা (যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা) তাদের উপর হারাম করেছেন।... যুদ্ধ হতে পলায়ন ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ, যা কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা ও অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কেরামের ঐক্যমতে প্রমাণিত।" –তাফসীরে কুরতুবী ৭/৩৭১

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল মাজিদে ইরশাদ করেন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল; যখন তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তাঁরা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।" –সূরা তাওবা (০৯) : ৩৮-৪১

মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ বলেন–

"যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; অর্থাৎ কোনো এলাকায় শত্রুরা আক্রমন চালায়, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ফরজ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর বর্তায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী, 'তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও' বলা হয়, আয়াতটি নাফিরে আম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।" [বাদায়িউস সানায়ি': ৭/৯৮]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন-

"কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। চতুর্থ মাসআলায় এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উক্ত অবস্থা হল, যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারী (সরঞ্জামধারী), যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ, শত্রুর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক, জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি

যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ, শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।" -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২

ইমাম কুরতুবী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন।

১. যখন শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয়। (بغلبة العدو على قطر من الأقطار)

২. যদি শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। (بحلوله بالعقر)

৩. যদি শত্রু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের দিকে আসতে থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে। (لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها)

এই সকল সূরতে জিহাদ ফরজে আইন। তা বহাল থাকবে যতক্ষণ না শত্রুকে পূর্ণ পরাস্ত করা যায় এবং দারুল ইসলাম থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা যায়।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে

আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।" [–সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু: ৮৫২ হি.) বলেন–

"উক্ত হাদীসের অর্থ হল, মক্কা বিজিত হয়ে দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার দ্বারা মক্কা থেকে হিজরত করার ফরজিয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় জিহাদে বের হওয়া তেমনি ফরজ রয়ে গেছে, যেমন আগে ফরজ ছিল। (فإذا استنفرتم فانفروا) দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যখনই তোমাদের জিহাদের জন্য আহবান করা হবে, তোমরা সাড়া দেবে।" -ফাতহুল বারী: ১৫/৭৮

কাজি ইয়ায রহ. বলেন–

"(وإذا استنفرتم فانفروا) তথা 'যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়' -এর দু'টি সূরত রয়েছে। যদি এমন কোনো শত্রু প্রতিহত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন। একইভাবে যে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রতিহত করার জন্যে জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়। এই দুই সূরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের জন্য জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দু'টির মতো জোরদার ফরজ নয়।" -ইকমালুল মু'লিম: ৬/২৭৫

এই পরিস্থিতিকে ফিকহের পরিভাষায় নাফিরে আম বলা হয়। নাফির অর্থ যুদ্ধে বের হওয়া, আর আম অর্থ ব্যাপক। 'নাফিরে আম' দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যখন শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সকলের জিহাদে বের হওয়া প্রয়োজন হয়ে

পড়ে। কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে যেহেতু তাদের প্রতিহত করতে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে জিহাদে বের হতে হয়, তাই এ অবস্থাকে নাফিরে আম বলা হয়। নাফীরে আমের অবস্থায়ও সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের উপর জিহদের হুকুম

বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্বের সকল সক্ষম মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে আ'ইন। কারণ বর্তমান সমগ্র বিশ্বেই আজ মুসলিমরা কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত। মুসিলিমরা যখন আক্রান্ত হয়, তখন তা প্রতিহত করার জন্য প্রথমে আক্রান্তদের উপর এবং তারা প্রতিহত করতে সক্ষম না হলে কিংবা প্রতিহত না করলে, তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর, তারপর তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর; এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সালাফ ও খালাফের অনেক ফকিহই এবিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন–

"সকল মুসলমানের প্রসিদ্ধ আকীদা, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আশঙ্কা করে; আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে; ফলে তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শঙ্কাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, শত্রুর ক্ষতি থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে পরিমাণ লোক তাদের সাহায্যে জিহাদে বের হওয়া। এবিষয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। এমন কথা কোনো মুসলমানই বলেনি যে, শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করবে, তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করবে, আর মুসলমানদের জন্য তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ হবে।" [আহকামুল কুরআন: ৪/৩১২]

ইমাম সারাখসী রহ বলেন–

“আর যখন নফিরে আমের অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেমন কোনো শহরবাসীকে বলা হল, ‘ শত্রু এসে পড়েছে; তোমাদের জান, মাল ও পরিবার পরিজনের উপর আগ্রাসন চালাতে চাচ্ছে, তখন সন্তান তার পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এঅবস্থায় জিহাদে বের হওয়া প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।’ (সূরা তাওবা: ৪১)। তাছাড়া এই ফরজ ছেড়ে দেয়ার দ্বারা যে ক্ষতি হবে, তা আর পূরণ করা সম্ভব হবে না; কিন্তু পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া বের হওয়ার দ্বারা যা ছুটবে, তা পরে পূরণ করে নেয়া যাবে। তাই যেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটাই করবে। তাছাড়া জিহাদ ছেড়ে দেয়ার ক্ষতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ ক্ষতি তার ব্যক্তি থেকে পিতা মাতা এবং অন্যান্য সকল মুসলমান পর্যন্ত গড়াবে। এ সময় জিহাদে বের হতে নিষেধ করাও তার পিতা মাতার জন্য জায়েয নয়। তাই তার বের হওয়ার দ্বারা যেন পিতা মাতা (ফরজ আদায়ে বাধা দানের) গুনাহ থেকে রক্ষা পায়, এজন্যও বের হতে হবে। আর যেখানে তারা (আল্লাহ তাআলার) নাফরমানি করবে, সেখানে তাদের আনুগত্য করা সন্তানের দায়িত্ব নয়।” [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৯৯]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন–

“কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। ... উক্ত অবস্থা হল- যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারি, যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ- শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) দল ভারি করতে সক্ষম,

এমন কেউ বসে থাকবে না। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক- জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।" [তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

"প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরজ দ্বিতীয় আরেকটি নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ও অন্যান্য (মাযহাবের) ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।" [আলফাতাওয়াল কুবরা: ৪/৬০৮]

সতর্কতা:

তবে জিহাদ মানেই না জেনে না বুঝে যখন তখন যেখানে সেখানে এলোপাতাড়ি কিছু আক্রমণ করে দেয়া নয়। এজন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট মাসআলা মাসায়েল আছে, শরীয়াহ'র সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। জিহাদের জন্য প্রথমে জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করতে হবে। তারপর শরীয়াহ ও সমর বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ'র নীতিমালা অনুসারে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ উদ্ভূত যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা। আর সন্ত্রাস অর্থ হলো, মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়, কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ, ভীতিকর অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পরিবেশ। সন্ত্রাসের সমার্থক শব্দ হিসেবে সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, বিভীষিকাপন্থা, সহিংস আন্দোলন, উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।

সন্ত্রাসবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "terrorism" । অক্সফোর্ড ডিকশনারি তে 'terrorism' এর অর্থ করা হয়েছে— 'the use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act' । অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন বা সরকার কে কাজ করার জন্য হিংসাত্মক কাজের দ্বারা বলপ্রয়োগ করা ।

সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদের সর্বজনবিদিত কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না।একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ মতবিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একপ্রকার অসম্ভবই বটে। কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা যেকোনো বিষয় বা মতবাদের সংজ্ঞার ভিন্নতা নির্দেশ করে। তাই দেখা যায়, এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে যে কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসের মতো নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত,

অপর গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সে কর্মকাণ্ডই স্বাধীনতা কিংবা স্বাধিকার সংগ্রামের মতো মহৎ ও প্রশংসনীয়।

সন্ত্রাসের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য তেমন না থাকলেও এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণে ব্যাপক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আর এই কারণেই আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসের সর্বসম্মত কোনো পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক মতবাদীই নিজ নিজ বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসকেন্দ্রিক আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে দুটি প্রধান দর্শন। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পাশ্চাত্য দর্শন। অপরটি ইসলামী দর্শন।

পাশ্চাত্য দর্শনে সংজ্ঞায়ন

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে- সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো সরকার, বেসরকারি জনগণ বা অন্য যেকোনো অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।

বর্তমানে সন্ত্রাস কোনো বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নয়। এটি এখন একটি মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাই সন্ত্রাসভিত্তিক বা কেন্দ্রিক মতবাদ ও কর্মকাণ্ডকে বোঝাতে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি বহুল প্রচলিত। অভিধানে ‘সন্ত্রাসবাদ’ অর্থ লেখা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা-অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠাননীতি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা উচিত- এই মত।

ইউনাইটেড নেশনস ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে সন্ত্রাসবাদের এর একটি সংজ্ঞা প্রদান করে , তাতে বলা হয়–

"যে কাজ সাধারণ ও অসামরিক নাগরিক দের মৃত্যু ঘটানোর জন্য বা গুরুতর ভাবে আহত করার জন্য ব্যবহার করা হয় , তাই সন্ত্রাসবাদ । এর উদ্দেশ্য হল কোনও একটি জনগোষ্ঠী কে বা সরকার কে বা কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা কে কিছু করতে বাধ্য করা বা কিছু করা থেকে বিরত হতে বাধ্য করা ।"

আভিধানিক ভাবে বিচার করলে বলা যায় , যে উদ্দেশ্য তারা পূরণ করতে চায় সেটির জন্য হিংসাত্মক কাজের দ্বারা সরকার ও জনগণের মধ্যে তারা ভয় বা ত্রাসের সৃষ্টি কে তারা উপায় হিসাবে গ্রহন করে । কিন্তু উদ্দেশ্যটি সৎ না অসৎ, তা পরিষ্কার নয় । অর্থাৎ, উভয়ই হতে পারে ।

একটু খেয়াল করলে দেখা যায় , সন্ত্রাসবাদের আভিধানিক অর্থ মেনে নিলে, পৃথিবীর অনেক মহান বিপ্লবীকেও সন্ত্রাসবাদী বলতে হয় । কেননা তারাও সরকার পরিবর্তনের জন্য হিংসার আশ্রয় নিতেন । কিন্তু বর্তমান কালে সন্ত্রাসবাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত আলাদা । মানুষ সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী দের প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে । তাদের এক ক্যাটাগরি তে ফেলতে চায় না । তারা জানে যে সন্ত্রাসবাদ অসৎ উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় । সমাজ দার্শনিক গন মনে করেন , বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী দের মূল পার্থক্য হল –একজন ন্যায়ের জন্য অস্ত্র ধারণ করে অন্যজন অন্যায় দাবী আদায়ের জন্য অস্ত্র ধারণ করে । বিপ্লবীরা কখনোই নির্দোষ মানুষকে হত্যা করতে চান না । কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা নির্দোষ মানুষকে হত্যা করেই কাজ হাসিল করতে চায় ।

ইসলামে সংজ্ঞায়ন

আরবি ভাষায় সন্ত্রাস শব্দের প্রতিশব্দ হলো 'ইরহাব'। এ শব্দটি এসেছে 'রাহবুন' থেকে যার অর্থ 'খাফ' বা ভীত হলো, ভয় পেলো ইত্যাদি। আর 'ইরহাব' অর্থ হলো 'তাখভিফ' ও 'তাফজি', তথা ভীতিপ্রদর্শন, শঙ্কিতকরণ, আতঙ্কিতকরণ।

আল-মাওসুআহ আল-আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা।

এখান থেকে সন্ত্রাসের অর্থ যদি শত্রু-মনে(এখানে শত্রু বলতে ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আল্লাহ ও ইসলামের শত্রুকে বোঝানো হয়েছে) ভীতি প্রদর্শন করা নেওয়া হয় তাহলে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ ইসলামী আইনে অনুমোদিত। যেমনটা আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেছেন–

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ

‘আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে।’ (সূরা আনফাল-৬০)

অপরদিকে–

‘রাবিতাতুল আলামিল ইসলাম’ পরিচালিত ‘ইসলামী ফিকহ কাউন্সিল’ ১৪২২ হিজরিতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে- ‘কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কোনো মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।’ এ সংজ্ঞা সব ধরনের নীতিবহির্ভূত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচারবহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যেকোনো ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন কর্মকাণ্ডকে শামিল করে।

সন্ত্রাসবাদকে যদি উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা চিত্রায়িত করা হয় তাহলে এরূপ সন্ত্রাসবাদ ইসলামী আইনে অনুমোদিত নয়। কেননা এক বাক্যে ইসলামের সংজ্ঞায়ন হচ্ছে, ‘ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম’। তাই হীন উদ্দেশ্যে বা অন্যায়ভাবে সাধারন মানুষকে হত্যা করা বা ভীতি প্রদর্শন করা অথবা জনসাধারণের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা ও জীবনকে দূর্বিসহ করে তোলা এসব কাজ ইসলামের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে হ্যাঁ, কাজের উদ্দেশ্য হীন নাকি মহৎ অথবা কাজের ধরন ন্যায় নাকি অন্যায় এটা কে বা কারা নির্ধারণ করছে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশ্চিমা ধর্মহীন নীতি দ্বারা বিচার করতে গেলে মুজাহিদীনগণের মহৎ উদ্দেশ্যকেও হীন মনে হবে। আবার পশ্চিমা সভ্যতার ওয়াফাদারগণ(মুসলিম/কাফির, আলিম/জাহিল) তাদের স্বার্থ রক্ষায় শার’ইয়াতের বৈধ পদ্ধতীতে হওয়া কাজকেও অন্যায়/অবৈধ বলতে পারে। কাজেই উদ্দেশ্য মহৎ নাকি হীন অথবা পদ্ধতি ন্যায় নাকি অন্যায় তা নির্ধারণের মাপকাঠি অবশ্যই ইসলামী শার’ইয়াহ হতে হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় সংজ্ঞা অথবা প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বোঝায় তা প্রকাশের জন্য ইরহাব শব্দের ব্যবহার কুরআনে পাওয়া যায় না। এ প্রকারের সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বোঝানোর জন্য কুরআনে ‘ফিতনাহ’ এবং ‘ফাসাদ’ শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সিরাত বিষয়ক উর্দু বিশ্বকোষের ‘নুকুশ’-এর প্রসঙ্গে বর্ণনা নিম্নরূপ- পবিত্র কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, ঈমান, কায়-কারবার ইত্যাদি যার কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তা-ই হলো ‘ফিতনা’ এবং যার কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তা-ই হলো ‘ফাসাদ’।

কুরআনে ‘ফিতনা’ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে ‘ফিতনা’কে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হলো-

আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা, ইবাদতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ * وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

‘পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নির্যাতন) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।’ (সূরা বাকারাহ: ২১৭)

দুর্বলের ওপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘরবাড়ি জবরদখল করা এবং তাদের বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়াও ফিতনা। আল্লাহ বলেন–

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা আন-নাহল:১১০)

জবরদস্তিমূলকভাবে সত্যকে দমন করে এবং সত্যগ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। আল্লাহ বলেন–

‘ফিরআউন ও তার পরিষদ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় মূসার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। বস্তুত ফিরআউন ছিল দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’

মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বল প্রয়োগের চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন–

وَ اِنۡ كَادُوۡا لَيَفۡتِنُوۡنَكَ عَنِ الَّذِىۡۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِىَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهٗ ۖ وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوۡكَ خَلِيۡلًا

‘আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তারা পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন করো; তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।’ (সূরা আল-ইসরা:৭৩)

বিশ্বাসীদের বিপদে ফেলা। আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ

‘যারা বিশ্বাসী নর-নারীদের বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।’ (সূরা বুরুজ:১০)

অসত্যের প্রতিষ্ঠা, অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ, হত্যা ও রক্তপাত করা। আল্লাহ বলেন–

وَ لَوۡ دُخِلَتۡ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ اَقۡطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الۡفِتۡنَةَ لَاٰتَوۡهَا وَ مَا تَلَبَّثُوۡا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيۡرًا

‘যদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করত, তারা এতে কালবিলম্ব করত না।’(সূরা আহযাব:১৪)

যেসব আয়াতে ‘ফাসাদ’ শব্দকে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হলো-

অন্যায় শাসন ও হত্যাকাণ্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট করা। আল-কুরআন ফিরআউনকে ‘ফাসাদ’ সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কারণ সে তার প্রজাদের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করত এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাত, দুর্বলদের ও বিরোধীদের অন্যায়ভাবে হত্যা এবং তাদের সম্পদ লুট করত।

আল্লাহ বলেন-

اِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِی الۡاَرۡضِ وَ جَعَلَ اَهۡلَهَا شِیَعًا یَّسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةً مِّنۡهُمۡ یُذَبِّحُ اَبۡنَآءَهُمۡ وَ یَسۡتَحۡیٖ نِسَآءَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الۡمُفۡسِدِیۡنَ

‘ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানে অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।’(সূরা আল-কাসাস:০৪)

ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীতে বিকৃত পথে জীবন চালানো। প্রাচীনকালের আদ, সামুদ, লুত, মাদায়েনবাসীসহ বিভিন্ন জাতিকে আল-কুরআনে আল্লাহ ‘ফাসাদকারী’ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবনযাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবনকে চালিত করেছিল। আল্লাহ বলেন–

‘যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।’(সূরা ফাজর)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

أَئِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقۡطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأۡتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلۡمُنكَرَۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئۡتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

‘তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাকো এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাকো। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করো- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’(সূরা আনকাবুত:২৯)

আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তাও ফাসাদ। আল্লাহ বলেন–

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ

‘সে বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে, এরাও এরূপই করবে।’ (সূরা নামল:৩৪)

জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার করা। যে ধরনের শাসন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে আল-কুরআন ‘ফাসাদ’ নামে অভিহিত করেছে। আল্লাহ বলেন–

وَ اِذَا تَوَلّٰی سَعٰی فِی الْاَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیْهَا وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ

‘যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।’ (বাকারাহ:২০৫)

সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় আল-কুরআন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ বলেন–

الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِهٖ ۪ وَ یَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ یُّوْصَلَ وَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

‘যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরা বাকারাহ:২৭)

পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِیْنَ یُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُّقَتَّلُوْۤا اَوْ یُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

‘যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটা তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ

থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের মহাশাস্তি রয়েছে।' (সূরা মায়িদাহ:৩৩)

ইসলামে সন্ত্রাসবাদের সারকথা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলামে সন্ত্রাসবাদের সারকথা হচ্ছে– সন্ত্রাস বলতে যদি উদ্দেশ্যে হয় শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করা, আর শত্রু দ্বারা ইসলামের শত্রুকে বোঝায়, যারা মুসলমান ও ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ তাহলে এ প্রকার সন্ত্রাসী কার্যক্রম ইসলামে অনুমোদিত। কারণ দ্বীন হচ্ছে কর্তৃত্ব ও বিজয়। আর আল্লাহর দ্বীনের শত্রু যাদের বাসনা হচ্ছে যারা মুসলিম হুকুমাতকে মিটিয়ে দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করবে তাদের যদি ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখা না হয় তাহলে তারাই আগ বাড়িয়ে মুসলিমদের উপর সন্ত্রাস কায়েম করবে এবং জান-মালকে বিপর্যস্ত করবে। একজন আসামীর চোখে পুলিশ যেমন সন্ত্রাস ঠিক তেমনই কুফফারদের নিকট খোদ ইসলাম ই সন্ত্রাস।

কিন্তু যে প্রকার সন্ত্রাসবাদের জন্য কুরআনে ফিতনা ও ফাসাদ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে; যার অর্থ হীন স্বার্থে ও অন্যায়ভাবে ইসলাম মুসলিম ও নিরপরাধ সাধারন মানুষের ক্ষতি সাধন করা এরূপ সন্ত্রাসবাদ চর্চা ইসলামে গুরুতর অপরাধ।

মডারেট মুসলিম-সমাজ ও জিহাদ বিষয়ক সংশয়

আধুনিক বিশ্বের মুসলিমদের ওপর পশ্চিমাদের মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের ব্যাপারে ইতিহাসের অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে তারা মুসলিমদের বিশেষ একটা অংশকে আল্লাহর দ্বীন থেকে সরিয়ে নিজেদের অনুগত শ্রেণীতে পরিণত করেছে। তাদের এই আগ্রাসন এখনো চলমান রয়েছে; যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে শিল্প, সম্পদ ও চিন্তা-চেতনায় সবচেয়ে উন্নত হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। আর জিহাদ ও মুজাহিদিনরা তাদের এই ষড়যন্ত্রের সাম্রাজ্যের সবচেয়ে

বড় ত্রাস, তাই জিহাদ ও মুজাহিদিনদের নিয়ে ক্রমাগত মুসলিমদের মাঝে ও সারা বিশ্বে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কে প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছে সাধারণ মুসলিমদের পাশাপাশি কতিপয় আলিম শ্রেণী; যাদের মধ্যে কতক আবার সরাসরিই তাদের মদদ-পুষ্ট। যারা মুসলিম হিসেবে মারাত্মক হীনমন্যতার স্বীকার। এই শ্রেণীর মুসলিমদের চোখে পশ্চিমারা যেহেতু সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা তাই তারা নিজ ধর্মের পশ্চিমা ধারার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে চায়। মূল ধারার ইসলামকে তারা পশ্চাৎপদ মৌলবাদ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। নিজেদেরকে তারা মুসলিম দাবি করলেও ইসলামের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মূলধারার আলিমদের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে প্রাচ্যবিদদের ব্যাখা গ্রহণ করে। আর ইসলামের কোন বিধান পশ্চিমা দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেই বিধানের পশ্চিমা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে থাকে। পশ্চিমা কুফফার শক্তি ও তাদের অনুগত মডারেট মুসলিমদের প্রোপাগান্ডায় সৃষ্ট জিহাদ বিষয়ক কিছু সংশয় নিরসনের চেষ্টা করবো।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

জিহাদ যেহেতু শাব্দিকভাবে চেষ্টা,সাধনা, সংগ্রাম ইত্যাদি অর্থ প্রদান করা হয় তাই প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম ও আলিমগণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম চর্চার চেষ্টা, সাধনা করা, নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইলম অর্জন করা,অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া, মুসলিমদের ইসলাহ বা আত্মসংসোধনের চেষ্টা করা ইত্যাদি কাজকে জিহাদ অথবা বড় জিহাদ বলে থাকেন।

আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুম-আহকাম পালনের সকল প্রচেষ্টাকেই শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা যায়, কিন্তু আভিধানিক অর্থের অতিব্যবহার পারিভাষিক অর্থের বিকৃতির সুযোগ করে দেয়। যেমন ‘সালাত’-এর আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা। যে কোনো প্রার্থনাকেই সালাত বলা যায় এবং কুরাআন-হাদীসে কখনো কখনো তা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় ‘সালাত’ একটি নির্দিষ্ট ইবাদাতের নাম। সকল প্রার্থনাকেই সালাত বলে নামকরণ করলে তা দ্বিমুখি বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। প্রথমত কেউ হয়ত যে

কোনোভাবে প্রার্থনা করেই 'সালাত' কায়েম হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করবেন। দ্বিতীয়ত, কেউ সালাতের ফযীলত বা আহকামের আয়াত ও হাদীসগুলি সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবেন।

কেউ যদি নিজের জীবনে দীন পালন, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, ইলম শিক্ষা, হালাল উপার্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, অত্যাচারীর সামনে সত্য-ভাষণ, হজ্জ পালন বা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলেন তবে তা দূষণীয় নয়, বরং তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এগুলিকে পারিভাষিক "জিহাদ" মনে করা হলে তা বহুমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে জিহাদের ফযীলত ও আহকামসমূহ এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রবণতা দেখা দেবে।

কোনো কোনো আধুনিক গবেষক ও চিন্তাবিদ ইসলামী রাজনীতি বা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব বুঝাতে "জিহাদ" বলে অভিহিত করেছেন। "জামাআতুল মুসলিমীন" এরূপ ব্যবহারকে তাদের বিভ্রান্তির সমর্থনে ব্যবহার করেছে।

' 'ইসলামী রাজনীতি" বা "ইসলামী আন্দোলন"-এর মাধ্যমে "দীন প্রতিষ্ঠা" নামে মুমিন যে ইবাদতটি পালন করেন সে ইবাদতটির পারিভাষিক নাম হলো "আল্লাহর পথে দাওয়াত" বা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ"। এ কর্মকে "জিহাদ" বলায় অসুবিধা নেই। তবে এ কর্মই কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পারিভাষিক জিহাদ বা বলে মনে করার মধ্যে রয়েছে সমূহ বিপদ। আমরা বলেছি যে, ইসলামের পরিভাষায় "জিহাদ" অর্থই "কিতাল" বা যুদ্ধ। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণের ব্যবহারে এবং ফিকহ, তাফসীর বা ইসলামী জ্ঞানের যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ তালাশ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। বর্তমানে অনেক আধুনিক গবেষক ' 'ইসলামী রাজনীতি" বা "ইসলামী আন্দোলন"-কে "জিহাদ" নামে আখ্যায়িত করেন এবং একেই ইসলামী শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে গণ্য করেন। অনেকে পারিভাষিকভাবে "জিহাদ" ও ' 'কিতাল"-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। কিতালকে যুদ্ধ এবং জিহাদকে আন্দোলন বলে মনে করেন। এরূপ মতামত গবেষণা বা ব্যাখ্যা হিসেবে কেউ পেশ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের

পারিভাষা বলে গণ্য করার কারণে এবং রাজনীতি, দাওয়াত, আন্দোলন ইত্যাদিকে সদা-সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার কারণে কয়েকটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে:

প্রথমত, দাওয়াত, রাজনীতি, আন্দোলন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত মানুষ শরীয়ত নির্দেশিত ‘‘জিহাদ’’ ইবাদতটি পালন করছেন বলে ধারণা করছেন এবং হাদীসে ও ফিকহে জিহাদের যে সকল বিধান, সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করা হয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও পালনীয় বলে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দলবদ্ধ দাওয়াতের সাথে সংশিষ্ট না হয়ে যারা ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ওয়ায, লিখনী, শিক্ষাদান ইত্যাদি পদ্ধতিতে ‘‘আল্লাহর পথে দাওয়াত’’ বা ‘‘ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের’’ ইবাদতটি পালন করছেন তারা শরীয়তের পারিভাষিক ‘ ‘জিহাদ’’ নামক ইবাদতটি পালন করছেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

জিহাদের সমপরিমাণ সাওয়াব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীস পাওয়া যায় যেখানে, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাসবীহ আদায় করা,ফজরের নামাযের পর সূযোর্দয় পর্যন্ত মসজিদে বসে যিকির করতে থাকা, এরপর দুই রাকাত নামায পড়া,ফরয নামাযের জন্য মসজিদের উদ্দেশে বের হওয়া, দ্বীন শেখা বা শেখানোর লক্ষ্যে মসজিদে গমন করা, তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে পিতা-মাতার খেদমত করা ইত্যাদি কাজ করার মাধ্যমে হজ ও ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব ও ফজিলত লাভের কথা বলা হয়েছে। তার মানে কি এই যে, যে ব্যক্তির উপর হজ করা ফরজ সে হজে না গিয়ে ঘরে বসে এসব আমল করতে থাকবে? উত্তর হলো, ‘না’, এসব আমল করার পরও সে ফরজ হজ্ব আদায় না করার কারনে গুনাহগার হবে।

তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে পুরো কুরআন পাঠের সাওয়াব পাওয়া যায় তাই বলে কি মুসলিমরা কুরআন পাঠ করা, হিফয করা বাদ দিয়ে শুধু সূরা ইখলাসের তিলওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকছে? এশা ও ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় আদায় করলে এবং রাতে কুরআনের ১০০ আয়াত তিলাওয়াত করলে কিয়ামুল লাইলের সাওয়ায পাওয়া যায় তাই বলে কি মুসলিমরা রাতের শেষ প্রহরে উঠে সালাত আদায় বাদ দিয়ে দিয়েছে? এসবের ও উত্তর হলো, 'না'। অথচ জিহাদের প্রসঙ্গ আসলেই কতিপয় আলিমকে বলতে শোনা যায়, দাওয়াতের কাজে সময় ব্যয় করা, ইলম অন্বেষণ করা কিংবা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে জিহাদের ফজিলত অর্জনে চেষ্টা করার কথা। অথচ জিহাদ যখন ফরজ হয়ে যায় তখন এসব আমল করার দ্বারা জিহাদ ত্যাগের গুনাহ্ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাই জিহাদ

অনেককেই বলতে শোনা যায়, ই'লায়ে কালিমাতল্লাহ্ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই জিহাদ। বলা বাহুল্য, জিহাদ আভিধানিকভাবে শার'ইয়াহ্ সম্মত দিন প্রচেষ্টার সকল প্রষেষ্টাকেই বুঝায় এখন কুরআন ও হাদিসে কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু জিহাদ যা শার'ইয়াতের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম 'ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ্' তা কখনো এসব সাধারন কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয়, বরং এই অর্থে জিহাদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফফারদের দম্ভ চুরমার করার জন্য, এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করার জন্য কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

ফিকহের কিতাবাদিতে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লেখিত হয়েছে। সিরাতের কিতাব সমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। কোরআন হাদিসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফজিলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই

বলা হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হলেই সে প্রকৃত শহীদ। শার'ই নুসুস এবং শার'ই পরিভাষার উপর নিহায়াত জুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার উপর আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃত সাধন,যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তা'লিম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়ায-নসিহত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক কোনো কর্ম প্রচেষ্টা (যদি শার'ই নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মুতাবিক হয়) এই সব ই স্ব স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্ম-প্রচেষ্টার সবই খিদমাতে দ্বীনের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফাযাইল ভিন্ন মাসাইল ও ভিন্ন আহকাম রয়েছে এবং কোনটাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই কিন্তু এসবের কোনোটিই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যার ক্ষেত্রে জিহাদের ফাযাইল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং মনে রাখা জরুরী, কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরিফ(বিকৃতি) সাধন করে যাচ্ছে।

কেউ তাবলীগের কাজকে জিহাদ বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, কেউ আবার রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকে তো এ-ও বোঝা যায় পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণ ও জিহাদের শামিল। আল্লাহর পানাহ!

জিহাদে আকবার বা উত্তম জিহাদ

উপরের আলোচনা থেকে তাদের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা 'জিহাদ মা'আল কুফর' ও 'ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ্'র গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবার (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগারের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করে।

তাদের বক্তব্য হলো, নাফসের(প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ হলো ছোট জিহাদ।

এই ভ্রান্তির ব্যাপারে হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

"আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধরণা এই যে, কাফিরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর অর নাফসের মুজাহাদা(কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবার। যেন তারা নিভৃতে নাফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফিরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারনা ঠিক নয়, বরং বাস্তব কথা হলো, কাফিরদের সাথে লড়াই করা ইখলাসশূণ্য হলে বাস্তবিক অর্থেই তা নাফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের জিহাদকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নাফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে।

তবে কাফিরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এ ধরণের জিহাদকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাক্কিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফিদের বাড়াবাড়ি বরং এ ধরণের জিহাদ অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নাফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে অবশ্যই নাফসের মুজাহাদা বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযিলতই একত্রিত হচ্ছে।" [আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ]

জিহাদ কি ইক্বদামী,না শুধুই দিফায়ী?

শেষ জামানার কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও জিহাদের তাৎপর্য ও উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য লিখেছেন,এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী (প্রতিরক্ষামূলক) জিহাদ অনুমোদিত, ইক্বদামী (আক্রমণাত্মক) জিহাদের অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়তো জিহাদ সম্পর্কিত কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচারিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তি সমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হলো জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী জিহাদ শুধু অনুমোদিতই না; বরং কখনো কখনো ফরয ও প্রভূত সাওয়াবের কারন ও। কুরআন সুন্নাহর দলিলের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরণের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা মুফতি তাক্বী উসমানি (দা বা) এর ভাষায়–

"অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদন ও শারইয়াহ্ তে নেই। অন্যথায় জিযইয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ,ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারি উঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিত এবং মুসলমানগণ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তির চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করে ওই সব লোকেদের সামনে কেন লজ্জাবনত হব, যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় হত্যাযোগ্য সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে। যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত!" [জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফায়ী? ফিক্বহী মাকালাত]

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বাস্তবতা

ইসলাম হচ্ছে স্বতন্ত্র দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। যেখানে সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার। অপরদিকে ইতিহাস অধ্যায়ে আমরা আধুনিক পার্লামেন্ট-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উত্থান সম্পর্কে জেনেছি; যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি এক কুফরি দর্শন যেখানে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অথবা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে-ই অস্বীকার করা হয়। আমরা বৃত্ত চিনি, আবার ত্রিভুজ অথবা চতুর্ভুজ ও চিনি; যাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আকার রয়েছে এবং এই আকারগুলো একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখন কেউ যদি বলে 'ত্রিকোনী বৃত্ত' অথবা 'বৃত্তাকার চতুর্ভুজ' এটা কি কোনো অর্থপূর্ণ জিনিস হয়? এমন কিছু বানাতে হলে অথবা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্তের মধ্যে সমন্বয় করতে হলে সবাইকেই নিজের স্বকীয়তা বর্জন করতে হবে।

'ইসলামি গণতন্ত্র', 'সেক্যুলার মুসলিম', 'মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট' বিষয়গুলোও ঠিক তেমনই। এসব টার্ম আল্লাহর দ্বীনে চুড়ান্ত বিকৃতির নামান্তর। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের ইতিহাসে দেখেছি আল্লাহর দ্বিনে বিকৃতি তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও গজবপ্রাপ্ত জাতিতে হাটছি। পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম ও এই সময়ে এসে তাদের সরযন্ত্রে তাদের পথের পথিক হচ্ছে।

আমরাই প্রত্যহ আল্লাহর কাছে দুআ করি-

"আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের নিয়ামত দিয়েছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট ও নয়।" [সূরা ফাতিহা: ৬-৭]

অথচ আজ আমরা অন্ধের মতো তাদের দেখানো পথেই চলছি অনবরত। তাদের সৃষ্ট বিধান কে আল্লাহর বিধানের সাথে তুলনা করছি, আল্লাহর বিধানের সাথে মিশ্রিত করতে চাচ্ছি অথবা আল্লাহর বিধানের উপর শ্রেষ্ঠতা দিচ্ছি। অথচ আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللهِ فَاِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (একমাত্র গ্রহণযোগ্য) দ্বীন হলো ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।" [সূরা আলি-ইমরান:১৯]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের এই নাফরমনি ক্ষমা করে আমাদের হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন (আমীন)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামি গণতন্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্র বলে কোনো কিছু হয় না।

ইসলামে রাষ্ট্র বা 'দার' দুই প্রকার–

১. দারুল ইসলাম

২. দারুল হারব

দারুল হারব ও দারুল ইসলামের ভিত্তি হল, সে দেশে প্রচলিত আইন এবং শাসকের ধর্ম। দারুল ইসলাম এমন ভূখণ্ডকে বলা হয়, যা ইসলামি আইন মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং যার শাসক মুসলিম। পক্ষান্তরে দারুল হারব বলা হয় এমন ভূখণ্ডকে, যা মানবরচিত কুফরি আইনে পরিচালিত এবং যার শাসক কাফের বা মুরতাদ।

দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাসআলা ইসলামী শরীয়তের একটি বুনিয়াদী মাসআলা যার উপর আরোও অসংখ্য মাসআলার ভিত্তি। ফিকহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রায় সকল কিতাবে এর আলোচনা রয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করে অসংখ্য অগণিত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর যখন কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে একেক অংশে মুসলিম নামধারী একেক মুরতাদকে শাসন ক্ষমতায় বসায় তখন নতুন করে এ মাসআলার আলোচনার প্রয়োজন পড়ে।

কেননা আইম্মায়ে কেরাম একমত যে, ইসলামী শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র কাফের বা মুরতাদরা দখল তোকরে নিয়ে তাতে কুফরী তথা শরীয়ত বিরোধী বিধান চালু করে দিলে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে তা উদ্ধার করে ইসলামী শাসন জারি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র থাকে না, বরং দারুল কুফর তথা কুফরী রাষ্ট্র হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

এ হিসেবে বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সবগুলো আইম্মায়ে কেরামের সকলের ঐক্যমতে দারুল হারব।

১৮০৬ সালে শাহ আব্দুল আজীজ (রহ.) উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়েছিলেন। কালের বিবর্তনে সেই ইংরেজ শাসনামলেই কেউ কেউ উপমহাদেশ দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। তখন রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) পুনরায় উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে দলীল-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ দীর্ঘ এক ফতোয়া জারি করেন।

গাঙ্গুহী (রহ.) যদিও শুধু উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপর এই ফতোয়া প্রযোজ্য হয়ে পড়েছে। মুরতাদদের দখলে থাকা সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্র আজ এই ফতোয়ার আলোকে দারুল হরব প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা বর্তমান বিশ্ব ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি; যেখানে মুসলিম সমাজ এক কুফরি ধর্মহীন শাসনব্যবস্থার গোলাম হয়ে আছে। মুসলিমদের ভূমি গুলোর উপর কুফফাররা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবেধ আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। শাইখ ডা. আব্দুল্লাহ্ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

"যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও কুফফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ করা ফরযে আ'ইন(সবার জন্য ফরয) হয়ে যায়। এই মুহূর্তে জিহাদের বের হওয়ার জন্য সন্তানের প্রয়োজন হয় না পিতামাতার অনুমতির এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।"

জিহাদের হুকুম সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি বর্তমান বিশ্বের সকল সামর্থবান মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এই ফরয আঞ্জামের চেষ্টা করা। সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা, অন্যদের জানানো ও সচেতন করা, নিজেকে ও অধিনস্তদের প্রস্তুত করা।

দীর্ঘ আলোচনার যা কিছু সঠিক ও কল্যানকর ছিল তার সবটাই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুল ও অকল্যাণকর তা আমার ও শাইতানের পক্ষ থেকে।

রেফারেন্স

যে সকল বই ও ওয়েবসাইটের সাহয্য নেয়া হয়েছে–

ইতিহাস অধ্যায়

১। ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা- হেদায়াতুল্লাহ্ মেহমান্দ

তাত্বিক অধ্যায়-

১। কিতাবুল জিহাদ- আব্দুল্লাহ্

ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ

২। মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা- ডা. আব্দুল্লাহ্ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ

৩। হাদিসের আলোকে জিহাদ- মুফতি শফি রাহিমাহুল্লাহ

৪। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ- আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ

৫।hadithbd.net

৬।darulilm.org

৭।fatwaa.org

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111575281/